DECEMBER 2023

Monthly Bulletin

VOLUME LII, NO. 10

THE ASIATIC SOCIETY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

CONTENTS

Cover Description

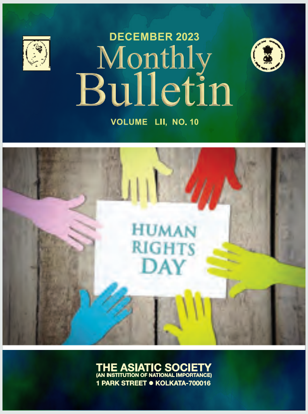

10 December 2023 marks the 75th Anniversary of one of the world's most groundbreaking global pledges : The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This landmark document enshrines the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being— regardless of race, colour, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

The Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 and sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected.

Available in more than 500 languages, it is the most translated document in the world.

Source:
https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

- From the Desk of the General Secretary 1
- Meeting Notice 2

Paper to be Read

- ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সমাজসংস্কারক ও কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র 3
  পূর্ণব্রত মিত্র

President's Column

- Farewell to RTI? What is happening to the Right to Information Act, 2005? 7

Centenary Tribute

- শতবর্ষে অভিনেত্রী শোভা সেন 11
  শম্পা সেন

Heritage Matters

- Memorials to Sir William Jones 20
  Pronoy Roy Chowdhury

North-East India

- লিম্বুয়ানা : হারিয়ে যাওয়া কিরাতভূমি 28
  দীপক নাগ

Revolt in Celluloid

- Coup Cinema, Chile Chapter 37
  Vidyarthy Chatterjee

History Matters

- খোঁড়ার মাঠ থেকে গিরিশ পার্ক 44
  সুবীর ভট্টাচার্য

History of Science : In-house Treasure

- Two Mss. on Astronomy and Mathematics of the Asiatic Society: Their Importance and Critical Appreciation 46
  Jagatpati Sarkar

Treasures of The Asiatic Society

- Pashto Manuscripts in the Collection of The Asiatic Society 49
  S.S.F.I. Al-Quaderi

Events

- One-Day Collaborative Seminar on 'Insights into Social Inclusion: Lived experiences of individuals with Autism and their families' 53
- Half-Day Seminar on 'Harappan Culture in Retrospect: Revisiting an Archaeological Discovery' 53
- Commemorating the Birth Centenary of Three Eminent Teachers 54
- Special Lecture on 'The Western Roots of Indian Script and the Indus Calendar' by Dr. Bradley R. Hertel 55
- Observation of 50th Death Anniversary of Nobel Laureate and Poet Pablo Neruda in collaboration with Rekha Chitram, Salt Lake 55
- Post-Congress of 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress 2023 56
- Report of the Two-Day Seminar on North-East India 57
  Satarupa Dattamajumdar

Books from Reader's Choice

- অনুসন্ধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ 58
  শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

From the Desk of the General Secretary

Dear Members and Well-wishers,

Due to my sudden admission in Hospital for a Pacemaker I have been unable to contribute my write-up in 'From the Desk of the General Secretary'. I may be excused for this lapse.

Please keep well and safe.

(S. B. Chakrabarti)
General Secretary

Azadi Ka Amrit Mahotsav · G20 · संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

The Asiatic Society

Founded in 1784

(An Institution of National Importance declared by an Act of Parliament)

and

(An Autonomous Organization under Ministry of Culture, Government of India)

Patron : Hon'ble Governor of West Bengal

Ref. No.: 121 | Date : 15-11-2023

NOTIFICATION

In pursuance of amended Regulation 37 of the Asiatic Society, Kolkata, an Election Committee comprising the following members is constituted for conducting the election of Office-Bearers and other Members of the Council to be held in the year 2024:

1. Shri Arijit Dutta Chaudhuri, Director General, National Council of Science Museums
2. Prof. Jayasri Ray Chaudhuri, Director of Public Instruction, Department of Higher Education, Government of West Bengal
3. The Registrar of Societies, Government of West Bengal or his representative not below the rank of Jt. Registrar

Shri Arijit Dutta Chaudhuri, Director General, National Council of Science Museums shall be the Chairman of the Committee.

(S. B. Chakrabarti) 15/11/23
General Secretary

Copy to all concerned

Election Matters

ATTENTION: ALL MEMBERS

Following the Regulations in respect of the election procedure of the Council of the Asiatic Society, Election of Office Bearers and other Members of the Council will be held in the year 2024. Ordinary members, who pay their subscription up to 31 st December, 2023 shall be entitled to participate in the Election process and cast their votes. Ordinary Members are therefore requested to immediately pay their subscriptions due upto 31st December, 2023.

AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 4TH DECEMBER 2023 AT 5 P.M. AT THE VIDYASAGAR HALL OF THE SOCIETY

MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 4th September, 2023.
2. Exhibition of presents made to the Society in September, October and November 2023.
3. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
4. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
5. Consideration of reports and communications from the Council as per Regulation 49(g).
6. The General Secretary is to report that in terms of the provision of Clause 6 of bye-laws IV of the Asiatic Society the name of Professor Sanghamitra Bandyopadhyay has been duly nominated by the Council in its meeting held on 27th September, 2023 for election as Honorary Fellow of the Society.
7. The following paper will be read by Shri Purnabrata Mitra :
   "Unabimsa Satabdir Anyatama Samajsamskarak O Karmabir Kishorichand Mitra".

1 Park Street, Kolkata-700016
Dated : 17.11.2023

(S B Chakrabarti)
General Secretary

PAPER
TO BE READ

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সমাজসংস্কারক ও কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র

পূর্ণব্রত মিত্র
অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর যাঁরা এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বেরোতে থাকলেন তাঁরা প্রায় সবাই সমাজের পথ-প্রদর্শক হলেন। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার শুরু হল। কিশোরীচাঁদ মিত্রও এই দলে প্রায় প্রথম সারিতে জায়গা পেলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের জন্ম ২৬শে মে, ১৮২২; পিতা রামনারায়ণ মিত্র। বাড়িতে গুরুমশাই ও মুন্সীর কাছে যথাক্রমে বাংলা ও পার্শী ভাষা শিখতে শুরু করলেন। কিন্তু দুটি ভাষার কোনটাতেই তেমন সুবিধে করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে বাড়িতে তাঁর অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র একটি অবৈতনিক স্কুল চালু করলেন, নাম Hindoo Benevolent Institution। প্যারীচাঁদ ছাড়াও এই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন রাজকৃষ্ণ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক প্রভৃতি। এঁরা সবাই স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন এবং বিনা বেতনে পড়াতেন। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলেই ভর্তি হলেন এবং এখানেই ইংরেজী শিক্ষা শুরু হল। H.L.V. Derozio, David Hare, D' Anslem-এর মতো নামী শিক্ষকেরা এই স্কুল সম্পর্কে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা এখানে নিয়মিত আসতেন, ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন, পুরস্কার দিতেন। অচিরেই কিশোরীচাঁদ এঁদের নজরে পড়ে যান এবং এঁরাই পিতা রামনারায়ণ মিত্রকে তাঁকে হিন্দু স্কুলে পাঠাতে বলেন। ১৮৩৪ সালে কিশোরীচাঁদ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রথম থেকেই নিজের মেধার পরিচয় দেন। ডেভিড হেয়ারের কাছে সরাসরি শিক্ষা লাভ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন যা তখন দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রমুখরা। কিশোরীচাঁদ ১৮৪২ সালে কলেজের পড়া শেষ করলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর মনে দেশবাসীর জন্য ভালো কিছু করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছে। সপ্তাহে বেশ কয়েক ঘণ্টা Alexander Duff-এর নতুন স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতে শুরু করেন। ঠিক এইসময়ে শুরু হয় তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যৌথ সম্পাদনায় *Bengal Spectator* পত্রিকা। লিখছেন রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ সিকদার, কৃষ্ণমোহন মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। কিশোরীচাঁদ ক্রমশ ইংরেজি ভাষা ও তার গঠনশৈলীতে উন্নতি ঘটাতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে ইংরেজিই তাঁর চর্চার মাধ্যম হয়।

১৮৪৩-এ তাঁর বাড়িতে Hindoo Theophilanthropic Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর নৈতিক ও ধর্মীয় ভাবনার উন্নতি ঘটানো। মূর্তি পুজো বিলোপের চেষ্টা ও সত্য, নৈতিকতা ও পবিত্র কর্তব্যগুলির পুজো করা। এই বিষয়গুলি সামনে রেখে বিভিন্ন প্রকাশনারও কথা ঘোষণা করা হয়। এখানে নিয়মিত সভা হত যেখানে আসতেন ও বক্তব্য রাখতেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ ব্যক্তি যথা— ডা. আলেকজান্ডার ডাফ, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। ১৮৪৩-এ কিশোরীচাঁদ Discourse on natural theology নামে একটি বক্তৃতা দেন যা খুবই প্রশংসা পেয়েছিল।

১৮৩৯-এ গঠিত হয় 'জ্ঞানউপার্জনী' সভা যার সাম্মানিক যৌথ সম্পাদক পদে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রায় সমস্ত দেশীয় শিক্ষিতজন এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের তালিকায় ছিলেন। কিশোরীচাঁদের দুটি রচনা যথাক্রমে Truth ও The present condition and future prospects of the educated natives প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়াও ১৮৪৩-এ Physiology of bones নামে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

১৮৪৩-এ তাঁরই উদ্যোগে Hare Anniversary Meetings নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং তাঁর বাড়িতে প্রথম সভা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ের ওপর তিনি বক্তব্য রাখেন, যেগুলির মধ্যে হিন্দু কলেজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬২) মেডিকেল কলেজ ও তার প্রথম সম্পাদক (১৮৬৪), দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী (১৮৭০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে বেশ কিছুকাল সহ-সম্পাদক পদে কাজ করেছিলেন।

লেখালেখির মানসিকতার জন্য *Calcutta Review*-তে রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্মকাণ্ডের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যা একজন বাঙালীর জন্য ইংরেজিতে লেখা প্রথম জীবনী হিসেবে আজও সমাদৃত। এটি এতই প্রশংসিত হয়েছিল যে মিস্টার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে, তৎকালীন বেঙ্গল সরকারের সচিব, তাঁকে সরকারি চাকরিতে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যা Bengal Civil Service-এর সদস্যদের সমান) যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান। কিশোরীচাঁদ রাজশাহী জেলার নাটোরে SDO হিসেবে যোগ দেন এবং যে পাঁচ বছরের অধিক ওই পদে ছিলেন তা তাঁর কর্মজীবনের সব থেকে উজ্জ্বলতম দিক। একজন অতি উচ্চশিক্ষিত ও উদার মনের দেশীয় ভদ্রলোক দেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া জেলায় সরকারি কাজের ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে থাকেন ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্থানীয় মানুষের মন জয় করে নেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেলে মেয়েদের স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, রাস্তা তৈরি, পুকুর খনন, ফেরী ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ চলতে থাকে।

১৮৫১ সালে নিজের খরচে নাটোরে একটি স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

১৮৫২ সালে হুগলী জেলার জাহানাবাদে সাব-ডিভিসনে বদলি হন এবং এখানেও কাজের দক্ষতার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পান। তৎকালীন Lt. Governor of Bengal—Sir Frederick Halliday তাঁর দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও কাজকর্ম দেখে সাত-আট বছরের কর্মজীবন অতিক্রান্ত হবার পরই তাঁকে আরও অনেক

উঁচু পদে কলকাতার Junior Magistrate হিসেবে নিয়োগ করেন।

কাজকর্মের মধ্যে জীবন-জীবিকার ব্যাপার থাকলেও কিশোরীচাঁদ লেখালেখির জগতেও নিজেকে সমানভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় কোনও বিষয়ই তিনি বাদ দেননি—জীবনী, আধ্যাত্মিকতা, আইন, সমাজবিদ্যা, কৃষি, রাজনীতি ইত্যাদি। শুরু করেন *Calcutta Review*-তে নিয়মিতভাবে লেখা যথা--- (1) Rammohun Roy (I)-1845, (2) Rammohun Roy (II)-1866, (3) Hindoo Women-1863, (4) Phases of Hinduism-1864, (5)Agriculture and Agricultural Exhibition in Bengal-1865, (6) Orissa–Past and Present-1866, (7) Hindu Medicine and Medical Education-1866, (8) Radhakanta Deb-1867, (9) Kulin Polygamy-1868, (10) Ram Gopal Ghose-1868, (11) Burdwan Raj-1872, (12) Nadia Raj-1872, (13) Cossimbazar Raj-1873, (14) Modern Hindu Drama-1873, (15) Kandi family-1874.

মোটামুটি এই সময়ে তিনি Social Reforms Association গঠন করেন তখনকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যথা—বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, কুলীন বহুগামিতা ইত্যাদি। এইসব আলোচনায় সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা যোগ দিতেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুগামিতা লেখাতে লিখেছেন যে কিশোরীচাঁদই বহুগামিতা বন্ধ করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন কারণ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৮৪২ সালে তিনি সরকারের কাছে এই প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে আদেশনামা বের করতে অনুরোধ করেছিলেন।

সেই সময়ে মফস্বল আদালতগুলিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন বলবৎ করা যেত না (Exemption Rule নামে পরিচিত)। কিশোরীচাঁদ এতটাই মাথা উঁচু করে থাকার লোক ছিলেন যে সরকারি কর্মচারী হয়েও এপ্রিল, ১৮৫৭ সালে টাউন হলে মফস্বল আদালতগুলিতে ইংরেজদেরও ফৌজদারী আইনের আওতায় আনার জন্য আবেদন করার সভায় (Non-Exemption Meeting) প্রস্তাবটিতে বক্তব্য রাখার সময়ে প্রচণ্ডভাবে সাহেব কর্মচারীদের আক্রমণ করেন। ওটি তাঁর সেরা বক্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদ্বারা ইংরেজ সাহেবরা তাঁর প্রতি বিরূপ হন। কিশোরীচাঁদ মাথা নত করার লোক নন। কাল বিলম্ব না করে অতি সম্মানিত ও লোভনীয় সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

কিন্তু কিশোরীচাঁদ দমবার পাত্র নন। নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাকে সাহিত্য ও রাজনীতির আঙিনায় কাজে লাগিয়ে দেশ সেবা শুরু করেন। সরকারি চাকরির খাঁচার বাইরে এসে হাতে সময় পেলেন। *Indian Field* পত্রিকায় যোগ দিয়ে লেখালেখি শুরু করলেন। কিছুকাল পরে এর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এবং সরকার বিরোধী লেখা শুরু করলেন। পত্রিকার বিক্রি হু হু করে বাড়তে থাকল। কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা হল— (i) The Ryot and the Zeminder-1859, (ii) Chaitanya-1859, (iii) Mutiny, Govt. and the people-1858, (iv) Education in India-1859, (v) Muffussil Police-1860।

কিশোরীচাঁদ Bethune Society-র অন্যতম পুরনো সদস্য এবং বহু মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন। Alexander Duff-এর সভাপতিত্বে ও Cecil Beadon, Lt. Governor of Bengal-এর উপস্থিতিতে ১৮৬২ সালে Bethune Society-র সভায় 'হিন্দু নারী ও দেশোন্নতিতে তাদের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন স্বয়ং Lt. Governor যার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও পরের সভাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন যথা— (১) কৃষি-১৮৬৪ (২) দুর্ভিক্ষের শিক্ষা-১৮৬৬।

১৮৬৬ সালে মেরী কারপেন্টার কলকাতায় আসেন। তাঁকে স্বাগত ভাষণের একটি সভায় কিশোরীচাঁদ নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে একটি বক্তৃতা দেন যা মেরী কারপেন্টারকে খুবই প্রভাবিত করে এবং তাঁর *Progress of Education in Bengal* বইটিতে এর সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

কিশোরীচাঁদ Bengal Social Science Association-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এখানে তিনি দুটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন— On the progress of Education in Bengal-1867, On the festival of Hindus-1868.

কিশোরীচাঁদ ১৮৫৯ সালে British Indian Association-এর সদস্য নির্বাচিত হন। এখানেও তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বহুবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। যেমন— Sir John Peter Grant-এর সম্মানার্থে-১৮৬২, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে-১৮৬১, রাধাকান্ত দেবের সম্মানার্থে-১৮৬৭, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে-১৮৬৮, রামগোপাল ঘোষের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে-১৮৬৮, Education and Road Cess Question-১৮৬৮, Permanent Settlement-১৮৭১।

তাঁর দাক্ষিণ্যের মনোভাব ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের কথা তাঁর সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন যে যখন আরেক সহপাঠী মাইকেল মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় আসেন তখন কিশোরীচাঁদ কলকাতার Presidency Magistrate। তিনি মাইকেলকে তাঁরই দোভাষী হিসেবে নিয়োগ করেন। তখনকার চলন অনুযায়ী তিনি কিন্তু মাইকেলের সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীর মত ব্যবহার করেননি বরং বন্ধুত্ব চালিয়ে গেছেন।

কিশোরীচাঁদ কেবল সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন নয়, এমনকী কৃষি, উদ্যানপালন, পুষ্প উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ও আগ্রহ নিয়ে পড়তেন ও নিজ জ্ঞানক্ষুধা নিবৃত্ত করতেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়মিতভাবে উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসে যেতেন। অত্যধিক পরিশ্রম তাঁকে ক্লান্ত করে দেয় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৬ই আগস্ট, ১৮৭৩-এ মারা যান।

Observance of the 175th Birth Centenary of Rastraguru Surendranath Banerjea

On 10 November 2023, The Asiatic Society observed the 175th Birth Centenary of Rastraguru Surendranath Banerjea. Honorable Justice (Retd.) Shyamal Kumar Sen graced the occasion as Guest-in-chief. The chief speakers for the occasion were Professor Tapan Kumar Chattopadhyay and Professor Arun Kumar Bandopadhyay.

After the felicitation of the dignitaries, Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of The Asiatic Society delivered the Welcome Address. The theme of the lecture was introduced by Suswagata Bandopadhyay, Member of The Asiatic Society. This was followed by an excellent talk by the Guest-in-chief. A painting of Rastraguru Surendranath Banerjea, drawn by Dr. Shankar Kumar Nath, Medical Science Secretary of The Asiatic Society was displayed in the Hall.

L to R : Dr. Satyabrata Chakrabarti, Professor Swapan Kumar Pramanick, Honorable Justice (Retd.) Shyamal Kumar Sen, Professor Arun Kumar Bandopadhyay, Professor Tapan Kumar Chattopadhyay and Professor Sujit Kumar Das

The first lecture of the day was delivered by Professor Tapan Kumar Chattopadhyay who spoke eloquently on 'Moderate Politics and Surendranath Banerjea'. This was accompanied by an equally enlightening lecture given by Professor Arun Kumar Bandopadhyay who highlighted the relevance of the book, *A Nation in Making*, authored by Surendranath Banerjea. The programme came to an end with Presidential Address delivered by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of The Asiatic Society followed by Vote of Thanks by Professor Sujit Kumar Das, Treasurer of The Asiatic Society.

President's Column

Farewell to RTI? What is happening to the Right to Information Act, 2005?

During the time of the UPA Government, the two most citizen friendly and welfare-oriented Acts which were passed by the then Government, were firstly, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which is welfare-oriented providing for Government of India Rural Employment Guarantee scheme stipulated with an aim of providing 100 days of employment to rural households. But the second law, which is a rights-guaranteed Act, providing for right to seek and to have information from the public authorities, was the Right to Information Act, 2005. This Act provides effective access to information for citizens of India, which is under the control of public authorities. It is aimed at promoting transparency and accountability in the working of every public authority. The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the functioning of the Government. The right to have relevant information from the state is guaranteed to the citizen. Information here means any material in any form like records, documents and any other relevant information which is available in the public sphere. In order to facilitate the creation of an 'informed citizen', the Act guarantees the right to :

1. Inspect works, documents and records.
2. Take note, extracts, certified copies of documents or records.
3. Take samples of materials.
4. Obtain information in the form of printouts, diskettes, floppies, tapes, videos, cassettes or in any other electronic mode or through printouts.

This obligation to provide demanded information is contingent on the part of any public authority which has been defined as any authority or body or institution of self-government established by or under the Constitution or by any law made by either parliament or state legislature or even a non-government organization substantially financed by the appropriate Government.

The key structural arrangement for meeting this obligation on the part of public authorities are the PIO or the Public Information Officers, who are the officers designated by the public authority in all the administrative units or offices under it to provide information to the citizens requesting for any information. On receipt of such a request, the authorities shall as expeditiously as possible and in any case, within 30 days of the receipt of the request, shall provide the information. Where a request has been rejected, the PIO shall communicate to the requester, the reasons for such rejection. There is a provision for creation of an appellate authority in such a case.

Section 8 of the Act elaborates the exemptions from such disclosures, the most important of which are the information,

disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence. Exemptions from such disclosures also include matters relating to commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosures of which would harm the competitive position of the third party. It is notable to mention here also that RTI cannot be filed against an individual, unless he or she holds office or authority in a Government institution.

The Act has also created such authorities as to oversee the functioning of these provisions through the commissioning of the Central Information Commission and the State Information Commissions. Section 18 of the Act provides, 'subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of this Central Information Commission or State Information Commission, to receive or inquire into a complaint from any person who has been refused access to an information requested under this Act. They can inquire into the matter having the power of a quasi-judicial authority. They can issue necessary direction or impose penalties in case of non-compliance. The CIC or the SIC shall have wide powers to deal with any such case and issue necessary instruction to any public authority for compliance. Autonomy is guaranteed to the functioning of such information commissions. As Section 17 provides, they can be removed from office only by order by the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry reported that the state CIO ought on such ground be removed.

The previous analysis of the provision of the Right to Information Act shows that no effort has been spared to ensure that the citizens get this proper information which are available in the public domain on the basis of which an informed citizenry can be ensured and responsibility and accountability on the part of the public authority can be created.

We are not arguing that the Right to Information Act, as enacted in 2005 and as amended in 2006 is self-sufficient and that no provision in the Act is there which can be abused or liable to misinterpretation. These are there, but on the whole, if sincerely implemented; they could open the door for a true informed society. But our contention is that this Act, after being promulgated, has been subjected to changes and systematic negligence of its provisions to the extent of sabotaging its enabling clauses resulting in the denial of the advantages of its provisions to the citizens. Some of these issues may be mentioned here.

The Damaging Effects of Subsequent Amendments:

We begin with the latest amendment to the Information Act which was enacted in 2023 itself. Some civil society activists have argued that the Digital Personal Data Protection Act (DPDP), 2023, may be the final nail in the coffin for the Right to Information Act. When the Right to Information Act was promulgated in 2005, it was hailed as a 'sunshine law'. But under the Data Act, the personal information of public officials will not be disclosed under the RTI Act. The provision that such information could be disclosed provided it served larger public interest has been done away with. A portal which creates a synergistic relationship between data providers and data consumers by providing easily accessible data sets –

A CHRS analysis showed that rejecting RTI on the basis that it was personal information under Section 8(1)(J) of the Act, was already becoming increasingly common. Of the applications rejected, 38% cited this section. The Ministries of Finance and Railways are the most frequent users of this provision. As a result, applicants

have to approach multiple authorities, eventually ending up at the doorstep of the state information commission and the CIC, but mostly without any tangible result. This tendency to invoke the 'personal information' clause was already there, but the passing of the Digital Personal Data Protection Act 2023 has legitimised it and put a seal of approval to the withdrawal of information. So the initial provision of the RTI, that of moving towards a right-based culture, have been belied. While the RTI Act "was a movement to overthrow the colonial legacy and move in a culture of transparency," yet, now, the position is that, lack of proactive disclosure by the Government, long delays, lack of punitive action when information is not given in time, all these have contributed to its slow death. Shailesh Gandhi, former Information Commissioner in the CIC, sarcastically described that RTI now has become the right to deny information.

We can here mention another Institutional amendment to the Act aimed at compromising this independence and autonomy of the Information Commissions, which, as we have earlier seen, was an integral part of the RTI Act, 2005. But the RTI Amendment Act. 2019 and its rules, cripple the objectivity and independence of the Central Information Commission (CIC) by bringing them under the yoke of the Government. As a result of the Amendment, the Centre shall have the power to set the salaries and service condition of information Commissions at Central as well as State levels: They are now appointed for such term as may be prescribed by the Central Government. While the original Act prescribes salaries, allowances and other terms of service of the State Chief Information Commissioner, as this same as that of an Election Commissioner and the salaries and other terms of service of the State Information Commissioners as the same as that of the Chief Secretary to the State Government, the amendment proposes that these shall be such as may be prescribed by the Central Government. This whole Amendment is seen as a threat to the independence of the Central Information Commissioner and this would reduce their ability to issue directives to senior Government functionaries. Justifiably, as the Parliamentarian, Jairam Ramesh has argued, the amendments gave the Centre unparalleled power to dictate the tenure, salaries and service conditions of the Chief Information Commissions and Information Commissions as par its whims and fancies.

Justice delayed is justice denied:

For the expeditious disposal of the petitions seeking information which are available in the public sphere, the Act provides a definite timeframe within which the petitions are to be disposed of. There is provision of penalty also if the timeframe is not adhered to. But over the years, the inability or unwillingness of the commission to dispose of cases, has resulted in a formidable number of backlog cases. A study by the Satark Nagrik Sangathan (SNS) found that there were over three lakh appeals and complaints pending in 26 information commissions as in June, 2022 across the country, up from about 2 lakh such pending cases in 2019. In Maharashtra, the backlog of applications is about 1 lakh, followed by Uttar Pradesh, where it is above 45000. On an average the Commission takes one year to dispose of a case. In some cases, like Jharkhand, the Information Commission is defunct as there are no officials to look into the cases. Anjali Bharadwaj, from the National Campaign for People's Rights to Information (NCPRI), says the backlash has been growing. "People have used the law to expose corruption, question human rights violations and show truth to power. This is perhaps the reason why there has been a strong backlash and consistent attempts have been made to weaken this right", she says. (Reference, Time Special Article, August 14, 2023)

Reluctance to Share:

There is, on the other hand, reluctance to share the demanded information from the bureaucracy. The RTI Act was based on the permise that all information, which was in public interest, should be made public unless it is in the interest of nation's security or unless it impacted on someone's privacy. However, it seems that the message is missed by the public authorities. Information on spending taxpayers' money, voter rights, criminal antecedents of elected representatives, have only been made public after years of advocacy and court cases. In 2011, Gandhi, as an election commissioner, had ordered RBI to make the list of loan defaulters public. Four years later, he reiterated his earlier order attaching the same. But the RBI authorities denied the same. The first instinct of the public authorities is to deny the required information. Instead of providing the proactive disclosure, as stipulated in Section 4 of the Act, it is now request-based information but even that demand is not met because the system sees RTI applications as a headache rather than a taxpayers' right for asking for information.

The Data Act (2023) earlier referred to provide that the personal information of public officials will not be disclosed under the RTI Act. But the provision that such information should be disclosed provided it serves a larger public interest, has also been done away with.

The Right to Information is an attempt to directly confront the culture of secrecy surrounding the acts of Government. Even the Act of 2005 goes so far as to assert that it shall have an overriding effect as stated here: "the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act."

Justice Krishna Aiyer's comment in the case of Maneka Gandhi Vs. the Government of India case, is noteworthy to mention here: "Government which functions in secrecy not only acts against the democratic decency but also buries itself with its own burial." Justice P. N. Bhagwati mentioned in the S. P. Gupta case, the concept of an open Government is the direct emanation from the right to free speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a). Therefore, disclosure of information with regard to the functioning of Government must be the rule and secrecy an exception."

So this right to information, not the right to know only, is an ingredient part of the RTI Act, 2005. But over the years, due to a series of amendments made to this Act and due to the emergence of a culture of ignoring of provisions of this Act by the Government in power, the rights governed under the 2005 Act are consistently and constantly being eroded.

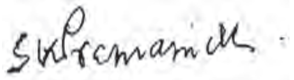

Swapan Kumar Pramanick
President

শতবর্ষে অভিনেত্রী শোভা সেন

শম্পা সেন
অধ্যাপিকা, গভর্ণমেন্ট গার্লস জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, একবালপুর

এক

এই বছরটায় বিচ্ছিন্নভাবে সামান্য কিছু উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে গ্রুপ থিয়েটারের পঁচাত্তর বছর উদ্‌যাপনের। কলকাতার 'মুখোমুখি' নাট্যদল-এর মতো হাতে-গোনা কয়েকটি থিয়েটারের দল বাংলা তথা কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের প্রবর্তনার সালটি (১৯৪৮)-কে মনে রেখে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেছেন নাট্য উৎসবের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, যে নাট্য ইতিহাস আমরা স্মরণ করছি তারও একটা উদ্যোগ পর্ব আছে। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই এদেশে সংস্কৃতি চর্চায় প্রথম জননাট্য বা 'পিপলস থিয়েটার'-এর অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতাপূর্বকালের ঔপনিবেশিক পরিধিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপ্তি—ইত্যাকার রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০২৩ সালে বস্তুতপক্ষে আশি বছর সম্পূর্ণ হল গণনাট্য সংঘের পথ চলার। 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন' (IPTA)-র গর্ভ থেকেই কয়েক বছর পর পর একটি একটি করে বিচ্ছিন্ন নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর ১৯৪৬ সালে তৈরি হয়[১] 'নবনাট্যম' সংস্থা। ভারতের স্বাধীনতা লাভের বছরই ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হয় 'শ্রীমঞ্চ' (১৯৪৭)। ১৯৪৮-এর জুন মাসে প্রখ্যাত নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা উৎপল দত্তের নেতৃত্বে তৈরি হয় 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'। এরপর ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায় নাট্যদল'ই, ১লা মে ১৯৫০ সালে 'বহুরূপী' সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। বাংলা থিয়েটারের নতুন ইতিহাস শুরু হয় 'বহুরূপী'-র নির্দেশক শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের নেতৃত্বে। শম্ভু মিত্রের নতুন শিল্পদৃষ্টি এবং নাট্য উদ্যোগ থেকেই 'সৎনাট্য' বা 'নবনাট্য' প্রবাহের শুরু। যদিও স্বাধীনতার সমকালে বা অব্যবহিত পরেই তৈরি হওয়া গ্রুপ থিয়েটার প্রবাহ বস্তুতপক্ষে 'গণনাট্য' বা 'পিপলস্ থিয়েটার' ধারারই সম্প্রসারণ ছিল।

অর্থাৎ পঁচাত্তর-আশি বছর ধরে গড়ে ওঠা, পেশাদারী বৃত্তের বাইরে বাংলা থিয়েটার আন্দোলনের এই যে ইতিহাস, তার পরিপ্রেক্ষিতটি আমাদের নাগরিক সাংস্কৃতিক-চৈতন্যের অন্যতম অবলম্বন। টি. এস. এলিয়েটের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিকে মাথায় রেখে বলব, উল্লিখিত 'ট্র্যাডিশন'-এর মাটিতে দাঁড়িয়েই আমরা স্মরণ করব 'ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট'-এর অবদানকে।

এই অবতারণার প্রয়োজন হল। কারণ ২০২৩ সালের পশ্চিমবাংলার দিশাহীন চালচিত্রে দাঁড়িয়ে আমরা প্রণতি জানাবো এমন এক নাট্যব্যক্তিত্ব-অভিনেত্রী-নাট্যসংগঠককে যাঁর জন্ম শতবর্ষ এই বছরই যথার্থ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি অভিনেত্রী ও সংগঠক শোভা সেন (১৯২৩-২০১৭)। দীর্ঘ প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে বাংলা মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে অভিনয়

করে গেছেন তিনি। কিন্তু ইতিহাস বিস্মৃত বাঙালি জাতি তাঁকে স্মরণ করে এই শতবর্ষে প্রায় কোন সভা-সমিতি-নাট্যোৎসবের আয়োজনই করেনি। এই উদ্‌ভ্রান্ত সমকাল যে দিশাহীন অন্ধকারে ডুবে আছে, শোভা সেন-এর মতো মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, সর্বোপরি অসামান্য দক্ষ এক সংগঠককে বিস্মরণ-এর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় মেলে। আমরা আর অস্তিত্বের শিকড়ের সঙ্গে ইতিহাসের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্ন হতে পারি না। 'তার ছিঁড়ে গেছে কবে'...

এই ছিন্ন তারকে যদি কিছুটা হলেও জুড়তে পারি, তবেই জন্মশতবর্ষে শ্রীমতী শোভা সেন-এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সার্থক হবে।

দুই

১৯২৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় (মুনশিগঞ্জ) তাঁর জন্ম। মামার বাড়ি ঢাকা আর বাবার বাড়ি ফরিদপুর হলেও নিতান্ত শৈশবেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ডাক্তারি পাস করেই তিনি সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে প্র্যাক্টিস শুরু করেন। শ্রীমতী শোভা সেন তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক বই *স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*-তে একেবারে প্রায় শৈশবকাল থেকে তাঁর জীবনের নানান স্মৃতিকে উজাড় করে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। সেই বই পাঠ করলে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের সঙ্গে একজন অবিস্মরণীয় অভিনেত্রীর সংস্কৃতিক যাত্রা পথের দীর্ঘ মানচিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।[২]

দেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে স্বদেশী আন্দোলনের আগ্নেয় সময়, স্বাধীনতা লাভ এবং তৎপরবর্তীতে দেশভাগের ক্ষত, দেশ-কাল-সমাজের আমূল মন্থিত পটভূমি, সেকালের বহু মানুষের মতোই শোভা সেনের মানসজগতকে বাল্যকাল থেকেই আলোড়িত করেছিল। তিনি তাই নানা স্মরণীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে চিহ্নিত করতে করতে এগিয়েছেন। ১৯৩০ সালেরও আগে থেকে তাঁর শৈশব-বাল্যের চোখে দেখা ঘটনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অসাধারণ প্রাঞ্জল অথচ গভীর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে তাঁর লেখা বই *স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*-তে। লেখা শুরু করেছেন তিনি এভাবে— "এ আমার আত্মকথা নয়, স্মৃতির রোমন্থন।"[৩] এখানে মূলত তাঁর থিয়েটার চর্চার পূর্ববর্তী জীবন, পড়াশুনো, অভিনয়শিক্ষা, চলচ্চিত্র এবং থিয়েটারে আত্মনিবেদন করার দীর্ঘ যাত্রাপথ, ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা, নানা ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। তাঁকে জানার জন্য মূলত আমাদের ভরসা – স্মৃতি। যাঁরা উৎপল দত্ত রচিত ও নির্দেশিত একের পর এক কালজয়ী নাটকে শোভা সেন-এর অভিনয় প্রতিভার অসামান্য শক্তি দেখেছেন, তাঁরাই আবিষ্কার করতে পারবেন একজন প্রকৃত থিয়েটার কর্মীর শৈল্পিক সত্তার সম্পূর্ণ উদ্ভাসের রহস্যকে।

বিশ শতকের একেবারে প্রথম পর্বে, মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যখন রীতিমত বাধা নিষেধ ছিল, তখন ছ'বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন বীণাপাণি হাইস্কুলে সরাসরি ক্লাস থ্রিতে। ওই শৈশবেই স্কুলের অনুষ্ঠানে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয় তাঁর 'অভিমন্যুবধ' নাটকে। সেই ছোট্টবেলার স্মৃতিটি তাঁর ছবির মতো স্পষ্ট। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বেথুন কলেজে ভর্তি হন তিনি ১৯৩৯ সালে। শোভা সেনের কলেজ জীবনের স্মৃতিচিত্র আসলে তাঁর অভিনেত্রী সত্তারই ক্রমিক উদ্ভাস। লেখাপড়ার পাশাপাশি নাটকের মহড়ায় আর স্টেজে মুক্তি পেত তাঁর সামূহিক অস্তিত্ব। এমনকি খেলার মাঠেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যতিক্রমী উপাদান নিতান্ত শৈশবেই অন্য অনেক মেয়ের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। এর মধ্যে তিনি আই.এ. পরীক্ষায় পাশ করার পরপরই দেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্ক, বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, অগণিত মানুষের মৃত্যু, অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক সংকট, ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র আন্দোলন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক বিস্তার— এক তুমুল আলোড়নের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশক। এই অস্থির পরিস্থিতিতে কলকাতা থেকে ১৯৪১ সালে

শোভা দেবী ও তাঁর ভাইবোনদের পাঠিয়ে দেওয়া হল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বেথুন কলেজও তখন মিলিটারিদের দখলে। এই টালমাটাল সময়-স্রোতের মধ্যেই ১৯৪২ সালে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়, মাত্র উনিশ বছর বয়সে, দেবপ্রসাদ সেন-এর সঙ্গে। প্রথম বিবাহের পর বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছিলেন তিনি। শোভা সেন-এর প্রথম দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল আঠারো বছর। তাঁর স্পষ্ট সত্যভাষণে উচ্চারিত হয়েছে জীবনের আপাততুচ্ছ অথচ মূল্যবান কতো ঘটনা। দাম্পত্যের টানাপোড়েন অশান্তি পরাধীনতা অসহায়তা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার আস্ফালন, পারিবারিক পীড়নের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এক অনমনীয় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিরামহীন লড়াই শোভা সেনের জীবন স্মৃতির মূল মন্ত্র।

১৯৪৪ সালে তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তন শুরু। নতুন আদর্শে দীক্ষিত হয়ে শোভা সেন এবার শিল্পী হিসেবে ক্রম বিবর্তনের পথে যাত্রা করবেন। ১৯৪৪ সাল থেকেই তাঁর গণনাট্য সংঘের মহলা কক্ষে পদার্পণ, বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের সাথে পরিচয়। আর ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'নবান্ন' নাটকে রাধিকা চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয়। তাঁর প্রথম স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির অনেকেরই যোগাযোগ ছিল। সে কারণেই হয়তো ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাটকে মহড়া দিতে যেতে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন শোভা সেনকে। আমাদের মনে রাখা দরকার, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে (১৯৪৩) আন্তর্জাতিক নাট্য প্রবাহের সঙ্গে অচিরেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল বাংলার থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাস। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে যে নতুন শিল্প ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে, সে নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র রাধিকাকে প্রাণ দিয়েছিলেন শোভা সেন। বাংলা থিয়েটারের চরিত্রটাকেই বদলে দিয়েছিল 'নবান্ন'। একটা নতুন নাট্য পরিকল্প বা প্যারাডাইম তৈরি হলো IPTA প্রতিষ্ঠার পর। পিপলস থিয়েটারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগের কর্ণধার বিজন ভট্টাচার্য বিশ্বাস করতেন— "The world today is clearly divided into two camps, the exploiters bent on crushing making under the judgement of the capitalist system and the classes striving to break through their oppressive control. The confrontation of the two camps is manifest in the cultural field where progressive cultural challenges and reactionary culture with a probing critique of the social sense."[৪] বিজন ভট্টাচার্যের এই মতামতের প্রেক্ষিতে আমাদের অনুধাবন করতে হবে শ্রীমতী শোভা সেনের মতো স্বাধীনতা পূর্বকালের অভিনেত্রীর আত্মিক-দার্শনিক-শৈল্পিক সত্তার আদর্শগত বিবর্তনকে। তাঁর দীর্ঘ অভিনয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে স্থির রাজনৈতিক বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধ, শিল্পের ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমে আস্থা সৃজনপথের রূপরেখাটি নির্মাণ করে দিয়েছিল। 'নবান্ন' নাটকে আলোড়ন সৃষ্টির পর শোভা সেনের অভিনেত্রী জীবনের সামনে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগও চলে এল একের পর এক।

এই নিবন্ধটিতে লিঙ্গ রাজনীতির প্রসঙ্গ বিস্তৃত নিয়ে আসার অবকাশ আমাদের নেই। তবে তাঁর জীবনের অকপট দিনলিপি প্রথম দাম্পত্য সম্পর্কের নানা ক্ষতচিহ্নকে উন্মোচন করেছে। তিনি বারবার আক্ষেপ করেছেন, বাড়ির বাধায় তাঁর ডাক্তারি পড়াও হয়ে ওঠেনি। শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হয়েও খেলার মাঠ ছাড়তে হয়েছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিবাহের পর থেকেই তাঁর দিনগুলি সুখের ছিল না। এই অবমাননার চিত্রে আমাদের অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বলা নারীমুক্তির অন্যতম চিন্তক অগাস্ট বেবেল-এর সেই কথাগুলি— 'The tyranny of men over women is similar to the tyranny of the bourgeoisie over the proletariat; in many ways the former is even worse.'[৫]

যে সময় পর্বের কথা লিখছি, সেটা চল্লিশের দশক।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের কালে অভিনয়ের মঞ্চে বা সিনেমায় মেয়েদের আসার বাধা-নিষেধের অন্ত ছিল না। উনিশ শতকের শেষার্ধে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পর থেকে পেশাদারী থিয়েটারের মঞ্চে যেসব অভিনেত্রীরা নাট্যশিল্পের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা কেউই তথাকথিত ভদ্রলোকদের সমাজে স্থান পাননি।[৬] নটী বিনোদিনী থেকে শুরু করে গোলাপসুন্দরী এমন অগণন মহিলা শিল্পী পতিতা হিসেবেই চিহ্নিত হতেন।

পেশাদারী থিয়েটারের এই বৃত্তের বাইরে প্রথম পিপলস থিয়েটারের ঘোষণাপত্র নিয়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হল। মহিলা অভিনেত্রীদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও একটা 'প্যারাডাইম শিফট' ঘটে গিয়েছিল তখন। প্রথম 'ভদ্রমহিলা' বা উচ্চকোটির সমাজ থেকে মেয়েরা প্রকাশ্য অভিনয়ে এসে সম্মান পাওয়া শুরু করল আই.পি.টি.এ.-র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দীক্ষা জননাট্যের সংঘবদ্ধ শক্তি, নাটকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় সম্পূর্ণ রূপান্তর, পরিবর্তিত দেশ কালের প্রেক্ষিতে মঞ্চের নারীশক্তিকেও মর্যাদা দিতে শুরু করল।

শ্রীমতী শোভা সেন এমনই এক বিস্তৃত কাল জুড়ে বাংলার থিয়েটার ও সিনেমার চালচিত্রে রয়েছেন যে, তিনি নিজেই যেন বাঙালির দীর্ঘ এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। অভিনয় জগতে নারীশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাঁর অনমনীয় শিল্পী সত্তার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ আমরা শুরুই করেছিলাম টি.এস.এলিয়েটের "ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট" প্রবন্ধটির সূত্র ধরে। শ্রীমতী শোভা সেন আমাদের থিয়েটারের বিস্তৃত কয়েকটি অধ্যায়ের ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতিনিধি। পেশাদারী অভিনয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শগত দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি থিয়েটারের মঞ্চে পা রেখেছেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বাক্ষর মঞ্চ নাট্যের পাশাপাশি একের পর এক চলচ্চিত্রে রয়েছে।

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন শোভা সেন। যেমন—১৯৪৯ সালে সত্যেন বসুর পরিচালনায় 'পরিবর্তন' ছবিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নাম এখানে উল্লেখ করছি।[৭]

চলচ্চিত্র	পরিচালনা	সাল
বামুনের মেয়ে	সব্যসাচী	১৯৪৯
মেজদিদি	সব্যসাচী	১৯৫০
বিদ্যাসাগর	কালিপ্রসাদ ঘোষ	১৯৫০
ছিন্নমূল	নিমাই ঘোষ	১৯৫১
বাবলা	অগ্রদূত	১৯৫১
কপালকুণ্ডলা	অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৫২
অন্নপূর্ণার মন্দির	নরেশ মিত্র	১৯৫৪
অভাগীর স্বর্গ	সলিল রায়	১৯৫৬
চিরকুমার সভা	দেবকী বসু	১৯৫৬
পরাধীন	মধু বসু	১৯৫৬
শিল্পী	অগ্রগামী	১৯৫৬
ত্রিযামা	অগ্রদূত	১৯৫৭
পথে হলো দেরি	অগ্রদূত	১৯৫৭
ডাকহরকরা	অগ্রগামী	১৯৫৭
সূর্যতোরণ	অগ্রদূত	১৯৫৮
লালুভুলু	অগ্রদূত	১৯৫৯
মেঘ	উৎপল দত্ত	১৯৬০
ঘুমভাঙার গান	উৎপল দত্ত	১৯৬২
শঙ্খবেলা	অগ্রগামী	১৯৬৬
বিলম্বিত লয়	অগ্রগামী	১৯৭০
নাগরিক	ঋত্বিক ঘটক	১৯৭৭
বারবধূ	বিজয় চট্টোপাধ্যায়	১৯৭৮
বৈশাখী মেঘ	উৎপল দত্ত	১৯৮১
ঝড়	উৎপল দত্ত	১৯৮২
মা	উৎপল দত্ত	১৯৮৪
মায়া মমতা	অঞ্জন চৌধুরী	১৯৯৩
পদ্মা নদীর মাঝি	গৌতম ঘোষ	১৯৯৩

উল্লিখিত কয়েকটি ছবির তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়, একদিকে তিনি যেমন সাহচর্য পেয়েছেন পুরনো দিনের অভিনেতা অভিনেত্রী—ছবি বিশ্বাস, সরযূ দেবী, প্রভা দেবী প্রমুখের, তেমনি উত্তমকুমারের মতো তারকাকেও ধীরে ধীরে বিকশিত হতে দেখেছেন। তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম গুরু হিসেবে

যেমন প্রভা দেবীর কথা বারবার সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন, তেমনি সরযূ দেবী, মলিনা দেবী, ভারতী দেবী এদের কথা শোভা সেন তাঁর নানা লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৩ সালে 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এর পক্ষ থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিভা আগরওয়ালকে বলেছেন অভিনয়ের একাল সেকালের কথা। কি অপার শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অগ্রজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে। শোভা সেন-এর নিজের কথায়— "এঁদের অভিনয়ের ধারা ও আমাদের অভিনয়ের ধারা অন্যরকম।...তাঁরা মানুষ হিসেবে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। (সরযূ দেবী, মলিনা দেবী, প্রভা দেবী) এঁদের আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা... অভিনয় শুধু নয়, সামাজিক মানুষ হিসেবেও কত উন্নত ছিলেন তাঁরা।"[৮]

পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলা সিনেমার পেশাদারী অভিনয়ের জগৎ, সেকালের কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের বৃত্তের সঙ্গে শোভা সেন-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আবার তার পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের প্রথম প্রযোজনা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শের দীক্ষা, তাঁর শিল্প অভিজ্ঞতার গণ্ডিকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে এসেছিল। সেকালের খুব কম অভিনেত্রীই আছেন যিনি শোভা সেনের মত অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে পিপলস্ থিয়েটারের মঞ্চে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সমকালীন অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র থিয়েটারের পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করলেও সেই সংখ্যা অনেক কম। আরেকটু পরে আমরা 'নান্দীকার'-এর প্রযোজনায় কেয়া চক্রবর্তীর অসামান্য অভিনয় দেখবো। তিনিও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অসংখ্য সিনেমা ও থিয়েটারে একই সঙ্গে অভিনয়ের বিরল সাক্ষ্য রেখে গেছেন শোভা সেন।

তিন

এখানে উল্লেখ করা দরকার, মেয়েদের শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা লাভও কিন্তু সহজ কাজ ছিল না। এখনও আমরা পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্র ও আধিপত্যবাদের একচেটিয়া সাম্রাজ্যে থিয়েটার সিনেমার জগতের মেয়েদের নানা লাঞ্ছনা ও অসম্মানের কথা জানি।[৯] ইতিহাস বলছে চল্লিশের দশকের ভারতে যখন কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশ তখন আই.পি.টি.এ.-র প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অনিল ডি সিলভা। অসাধারণ মেধাবী প্রতিভাময়ী বুদ্ধিদীপ্ত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত অনিল ডি সিলভা ছিলেন শ্রীলঙ্কার কন্যা। সিংহলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনিল ডি সিলভা শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে এসে মুম্বাইতে থাকতে শুরু করেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সংযোগ গড়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তিনিই দায়িত্ব নেন। কিন্তু অচিরেই অনিল ডি সিলভাকে সরিয়ে কে. এ. আব্বাসকে IPTA-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, সমালোচক সুধী প্রধানের *দ্য মার্কসিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করছি—About the first general secretary of the IPTA Anil De Silva, who was relieved of her position in 1946. [১০]

শ্রীমতী শোভা সেনের শিল্পীসত্তা ব্যক্তিত্ব প্রতিভা থিয়েটারের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও সংগঠক হিসেবে অবদান সবচেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছিল যাঁর কাছে, তিনি হলেন কালজয়ী নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত'র শ্রদ্ধাশীল ভালোবাসার প্রকাশ দেখি শোভা সেন-এর লেখা আত্মস্মৃতি *স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লাল দুর্গ* বইয়ের শুরুতেই। 'শোভাকে স্বপ্নবিলাসীর কবিতা'-য় উৎপল দত্ত লিখেছেন—

তোমার কাছে পাইনি ক্লীব বিশ্রাম
... তাই অনাগত কুয়াশা ঢাকা এক ভোরে
আমি চোখ মেলে দিয়ে দেখি
ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি
লড়ে যাচ্ছি দুই কমরেড।

এই কমরেড-এর সঙ্গেই শোভা সেন-এর দেখা হয়েছিল প্রথম ১৯৫৪ সালে। শেক্সপিয়রের নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত উৎপল দত্ত তখন কিছুদিন গণনাট্য সংঘে কাটিয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করেছেন (১৯৪৮)। মঞ্চ ও সিনেমার পরিচিত অভিনেত্রী শোভা সেনকে তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৫৪ সালে শেক্সপিয়ারের মহান ধ্রুপদী নাটক 'ম্যাকবেথ'-এর প্রথম শো হল নিউ এম্পায়ার হলে। লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় করলেন শোভা সেন। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হল বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের উদ্যোগ পর্ব। নবনাট্য সৎনাট্য ইত্যাদি ধারার তর্ক ও চর্চার মধ্যে এল.টি.জি. সম্পূর্ণ অন্য পথের দিশা দেখাল। আই.পি.টি.এ'-র থেকে আলাদা হলেও এল.টি.জি.-র নাট্য সংস্কৃতিতে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের লক্ষ্যটি ছিল স্থির। সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের আদর্শে বিশ্বাসী উৎপলবাবুর প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে 'রেভোলিউশনারি থিয়েটার'-এর প্রতি। পঞ্চাশ-ষাট দশকের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পর্বে এল.টি.জি.-র নাটক ভাবনায়, মঞ্চায়নে, প্রয়োগে এবং দর্শক সমাগমের ক্ষেত্রে এক একটি মাইল ফলক স্থাপন করে গেছে। ততদিনে শোভা সেন এল.টি.জি. নাট্য দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিষ্ঠা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও দলের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসায় সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্রমশ ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনে তিনি জড়িয়ে গেলেন। শ্রীমতী সেনের প্রথম দাম্পত্যের অশান্তিমুখর দিনযাপনের মাঝে এলেন উৎপল দত্ত। ১৯৫৪ সালের পর থেকে তাঁদের বন্ধুতার সম্পর্ক, থিয়েটারের মিলিত কর্মকাণ্ড, ক্রমশ বিবাহের পরিণতির দিকে এগোয়। প্রথম দাম্পত্যের বহু অশান্তি অত্যাচার অপমান শোভা সেনকে সত্যি সত্যিই তপ্ত অঙ্গারে পরিণত করেছিল। তাঁর নিজের কথায়—"আমি অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি, নারীত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানের শোধ নিয়েছি শুধু।"[11] তাই তাঁর প্রথম সন্তান থাকলেও বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৬১ সালের ২৯শে মার্চ উৎপল দত্তের জন্মদিনেই তাঁরা রেজিস্ট্রি বিবাহ করে জীবনের সৃজন অধ্যায়ের নতুন পর্ব শুরু করেছিলেন।

উৎপল দত্ত ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে জিওফ্রে কেন্ডালের সাথে শেক্সপিয়রের নাটকের দল নিয়ে ইউরোপ পরিভ্রমণ করলেও, স্বদেশের অস্থির সময় তাঁকে সমাজবাদে দীক্ষিত করে বাংলা থিয়েটারের ভূমিতে লগ্ন করে। রেভোলিউশনারি থিয়েটার বা বিপ্লবী নাট্যের পথ প্রদর্শক উৎপল দত্তকে বিবাহ করলেও শ্রীমতী সেন বারবার তাঁকে 'গুরু ও শিক্ষক' হিসেবেই সম্মান জানিয়েছেন।[12] লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রকৃত অভিযান শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ নয়া ভাবনা নিয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে। মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের ঝুঁকি ও স্বপ্ন সম্ভব হয়েছিল শোভা সেনের সংগঠক হিসেবে অসামান্য দক্ষতায়। অভিনয়ের নৈপুণ্য ছাড়াও দল পরিচালনায় আর এল.টি.জি.-র জন্য আত্মোৎসর্গে শোভা সেন ছিলেন ব্যারিকেডের সামনের সারির যোদ্ধা। ১৯৫৯ সালে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'ছায়ানট', 'ওথেলো' ইত্যাদি নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হলেও তেমন চলল না। মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে নাটক চালানো অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই সংকটকালে, ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিলো যে নাটক, তা হল বরাধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনার ওপর লেখা 'অঙ্গার' নাটক। 'অঙ্গার' নাটকে 'বিনুর মা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শোভা সেন। তার আগেই এল.টি.জি.-র প্রযোজনায় 'বিচারের বাণী' (১৯৫৩-৫৪), 'ম্যাকবেথ' (১৯৫৪), 'দ্বাদশ রজনী' (১৯৫৬), 'সিরাজদৌল্লা' (১৯৫৭), 'তপতী' (১৯৫৭), 'নীচের মহল' (১৯৫৭), 'অলীকবাবু' (১৯৫৮), 'শোধবোধ', 'ওথেলো' (১৯৫৮), 'ছায়ানট' (১৯৫৮), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৯৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৯৫৯) নাটকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি।

বাংলা থিয়েটারে এল.টি.জি. দল যুগান্তকারী

ইতিহাস সৃষ্টি করল প্রথম ‘অঙ্গার’ নাটকের মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে। উৎপল দত্তের নাটককার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃজনকাল শুরু হল। নির্দেশনার অভিনবত্বে আলোড়ন তুলেছিল সেকালের লিটল থিয়েটার গ্রুপ। এ নাটক দেখে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন—“বিষয়বস্তুর সঙ্গে এতটুকু আপস না করে পেশাদার থিয়েটারের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিটল থিয়েটার গ্রুপ।” এরপর থেকে একের পর এক নাট্যে উৎপল দত্ত এবং অন্যান্য অসাধারণ সব সহশিল্পীদের সঙ্গে স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন শোভা সেন। ১৯৬১ সালে আর এক ইতিহাস সৃষ্টি হল স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা ‘ফেরারি ফৌজ’ নাটকে। শোভা সেনের শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিত্ব এ নাটকের বঙ্গবাসী দেবীর চরিত্রে প্রতিফলিত হল। মিনার্ভা থিয়েটার হলে সম্পূর্ণ অন্য ধারার থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুললেন উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোদ্ধারা। ‘অঙ্গার’-এর পর ‘ফেরারি ফৌজ’ (১৯৬১) এবং ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ বাসন্তী চরিত্রে অভিনয়ের পরই ‘রোমিও জুলিয়েট’ (১৯৬৪)-এ ধাত্রী চরিত্র এবং ‘চৈতালি রাতের স্বপ্ন’ (১৯৬৪)-তে টিটানিয়া চরিত্রে অভিনয় শোভা সেনের মঞ্চ-প্রতিভার বহুমাত্রিক ব্যাপ্তি আর তাঁর বৌদ্ধিক পরিসরের পরিধিটিকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছে। যেকোনো চরিত্র রূপায়ণে অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজাত প্রতিভার নৈপুণ্য তাঁর স্থানকে চিরায়ত করে রেখেছে বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্যে।

এরপর আসবে বাংলা রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম মাইলফলক ‘কল্লোল’ নাটকের (১৯৬৫) প্রসঙ্গ। ব্রিটিশ বিরোধী নৌবিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা এই যুগান্তকারী নাটকে শোভা সেন অভিনয় করেছিলেন শার্দূল সিং-এর মা কৃষ্ণা বাঈ-এর চরিত্রে। জীবনের অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই অনমনীয় লড়াকু মায়ের চরিত্রে শোভা সেন-এর অভিনয় যেন মিথ্ হয়ে স্থায়ী হয়ে গেল বাংলা থিয়েটারের প্রবহমানতায়। ‘কল্লোল’ রাজনীতির ইতিহাসকেও তোলপাড় করে তুলেছিল। এই নাটক চলাকালীনই *দেশহিতৈষী* পত্রিকায় প্রকাশিত সরকার বিরোধী বক্তব্যের অপরাধে উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হল। এই আকস্মিক আঘাতেও ভেঙে পড়েননি শোভা সেন। নিয়ম করে জেল গেটে তিনি যেতেন উৎপল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে, ফিরে এসে মিনার্ভায় নাটক অভিনয় করতেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ে আরও বেশি শক্তি সঞ্চার করলেন শ্রীমতী সেন। দলের সবাইকে সাহস জুগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনয় যেন বন্ধ না হয়ে যায়। ‘কল্লোল’ হয়ে উঠল প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক। উৎপল দত্ত মুক্তি পাওয়ার পর ‘কল্লোল’-এর বিজয় উৎসবও পালিত হল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে। ষাটের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এরপর এল.টি.জি.-র ‘প্রফেসর মামলক’ (১৯৬৫), ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ (১৯৬৬), ‘তীর’ (১৯৬৭), ‘মানুষের অধিকারে’ (১৯৬৮), ‘যুদ্ধং দেহি’ (১৯৬৮), ‘লেনিনের ডাক’ (১৯৬৯), নাটকে অবিচ্ছিন্নভাবে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রূপদান করেছেন শোভা সেন। এরপর উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত ‘বিবেক নাট্য সমাজ’-এর প্রযোজনায় ‘শোনরে মালিক’ (১৯৬৯), ‘রাইফেল’ (১৯৬৯) নাটকে রেবা ও সৌদামিনীর ভূমিকায় শোভা সেন অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নানা প্রতিকূলতা ও ভাঙন পেরিয়ে সত্তর দশক থেকে শুরু হয়েছিল তাঁদের নতুন নাট্যদল পি.এল.টি. (পিপলস্ লিটল থিয়েটার)। রাষ্ট্রশক্তির স্বৈরাচার, কমিউনিস্ট দমন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশজুড়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, ভয়ংকর রাষ্ট্রশক্তির দমননীতি ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেই দেশজুড়ে এমার্জেন্সি জারি; —ইত্যাকার ঘটনাপ্রবাহের রাজনৈতিক ইতিহাস ধারণ করে আছে পি.এল.টি. গ্রুপের একের পর এক নাটক। কখনো অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে, কখনো বা বর্তমানের জ্বলন্ত বাস্তবতাকে সাম্প্রতিকের আধারেই চিত্রিত করেছেন উৎপল দত্ত। তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী থিয়েটার। "The revolutionary theatre addresses these working masses and must adjust its pitch, tone and volume accordingly, and to hell

with the so-called critics who find our plays naive, melodramatic and loud."[১৩]

বিপ্লবী থিয়েটারের একজন আদর্শ সংগঠক এবং প্রকৃত রাজনৈতিক দায়বোধের দ্বারা দীক্ষিত শিল্পী শোভা সেন যথার্থই উৎপল দত্তের সহযোদ্ধা কমরেড ছিলেন। মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে যখন অভিনয় চলছে প্রতিদিন, তখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে শোভা সেন নিজের বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা জোগাড় করেছেন থিয়েটারের জন্য। দিনের পর দিন প্রায় অভুক্ত থেকেও নাটকের মঞ্চে জীবনের সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন।

সত্তর দশকে পি.এল.টি. তৈরির পর শত রাজনৈতিক বাধার মধ্যেও তাঁদের আপসহীনতা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে উপহার দিয়েছে অবিস্মরণীয় সব প্রযোজনা। শোভা সেনকে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল চরিত্রসমূহে রূপদান করতে দেখেছি আমরা। যেমন—‘ঠিকানা’ নাটকে রসিদা নানী (১৯৭১), ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে সেই কালজয়ী বসুন্ধরা চরিত্র (১৯৭১), ‘সূর্যশিকার’-এ উর্মিলা (১৯৭১), ‘ব্যারিকেড’ নাটকে ইঙ্গেবর ৎআউরিৎস (১৯৭২), ‘তিতুমীর’-র জঞ্জালি (১৯৭৮), ‘দাঁড়াও পথিকবর’-এ সরযূমণি (১৯৮০), ‘মালোপাড়ার মা’ নাটকে তহমিনা বিবি (১৯৮০), ‘নীচের মহল’-এ অন্নদা (১৯৮৮), ‘হিম্মৎবাঈ’ (১৯৮৮) নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ‘নীল সাদা লাল’ (১৯৮৯) প্রযোজনায় অনবদ্য অভিনয় করে গেছেন।

একদিকে পুরনো ধারার পেশাদারি মঞ্চ ও সিনেমায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, আর অন্যদিকে সম্পূর্ণ আধুনিক গণ নাটকের শিল্পরীতি, তাঁর মঞ্চাভিনয়ে বহুমাত্রিকতা যোগ করেছিল। পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ, মূলত ইউরোপের জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্স ইংল্যান্ড আমেরিকা হাঙ্গেরি তাশখন্দ চিন বাংলাদেশ এমন অজস্র দেশে থিয়েটার উৎসব আলোচনা সম্মেলন প্রভৃতিতে অংশ নেওয়া ছাড়াও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য ছিল নানা দেশের থিয়েটার অপেরা ব্যালে মিউজিকের বিচিত্র ভান্ডারকে অন্বেষণ করা। নিজের চোখে দেখা। সংস্কৃতির এই বৈশ্বিক চিত্রের সঙ্গে আত্মিক যোগ শোভা সেন এবং উৎপল দত্তের নাটকে অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিকতার মাত্রা যোগ করে। শোভা সেন যেমন স্থিতধী ব্যক্তিত্ব, কঠোর মনোবল নিয়ে একজন প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মীর মতো দল সামলেছেন, তেমনি ‘ইয়োরোপের থিয়েটার চষে ফেলে আত্মস্থ করে নিজের অভিনয় শিল্পকে... সমৃদ্ধ করেছেন’।[১৪] উৎপল দত্ত শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতার সঙ্গে শোভা সেনের আত্মস্মৃতির ভূমিকায় লিখেছেন—‘কী চোখে শিল্পী সমাজ সংঘর্ষগুলি অবলোকন করবেন, তা হেলেনে ভাইগেলই শিখিয়েছেন শ্রীমতী সেনকে...’।[১৫] বের্টোল্ট ব্রেশট্-এর স্ত্রী হেলেনে ভাইগেলের কালজয়ী অভিনয় দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তাঁর সান্নিধ্য শোভা সেনের শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিত্বের ক্রমিক বিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

তাঁর দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্প-বোধের কোনও দূরত্ব ছিল না। আমাদের প্রত্যেকের যে নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে—শ্রীমতী সেন এ বিষয়ে অসাধারণ সজাগ ছিলেন। বর্ষীয়ান শিল্পী ১৯৮৩ সালের এক সাক্ষাৎকারে নাট্যসংগঠক প্রতিভা আগরওয়ালের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন—‘সবাই তো পলিটিক্যাল থিয়েটার করে। আপনি যেটা করছেন, সেটাও... সকলেই আমরা রাজনীতি করছি। আপনি এক পক্ষে করছেন। আমরা আর এক পক্ষে প্রচার করছি’।[১৬]

অর্থাৎ কোনো আড়াল ভান বা নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ নয়। ‘রেভোলিউশনারি থিয়েটার’ বা বিপ্লবী থিয়েটারের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবেই শিল্পকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং তাঁর ‘গুরু ও শিক্ষক’ উৎপল দত্ত। শতবর্ষ পেরিয়েও তাই সঙ্গত মনে হয় উৎপল দত্তের কবিতার সেই অমোঘ পংক্তি—‘এ সমাজে তুমি বাঁধা পড়ো না / তাই তুমি বিপ্লবের পথচারী’।[১৭]

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ বামপন্থী শিল্প-সাংস্কৃতিক মঞ্চের পাশাপাশি ১৯৪৩-এর ১৪ই অক্টোবর “কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ”-ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ দ্র. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ২০১৭।

৩ তদেব, পৃষ্ঠা ১।

৪ Bijan Bhattacharya, *Theatre and Social Realism*, First published in Bijan Bhattacharya: Likhan Bhasan (ed.) Shibaditya Dasgupta. *See.* [eds.] Samik Bandyopadhyay, Kamal Saha, Theatre movement in Bengal and our colleagues on the stage, All India Cultural Workshop, Kolkata, 2005.

৫ *See*, August Bebel, "uber die gegenwartige und kunftige stellung der Frau", 1878 [ed.] *Nancy Holmstrom, The Socialist Feminist Project*; A Contemporary Reader in Theory and Politics, Aakar, N. Delhi, 2011, p.18.

৬ ১৯৭৫ সালে রাশিয়ান নাট্যপ্রেমী নির্দেশক হেরেসিম লেবেদফের পরিচালনায় “দ্য ডিসগাইস” (কাল্পনিক সংবদল) নাটকে প্রথম পাঁচ জন মহিলা অভিনেত্রী নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতিতে নারীদের প্রকাশ্যে অভিনয় নিন্দিত হতো বলেই তথাকথিত ভদ্র ঘরের মেয়েদের থিয়েটারে অভিনয় করতে দেখা যায়নি। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষরাই। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে হাওড়ার দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার-এ ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকে দুজন মহিলা নারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। *ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ*-এ এই তথ্য পাওয়া যায়। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস থেকে জানতে পারি নানা কুৎসা সত্ত্বেও ‘বেঙ্গল থিয়েটার’-এ মেয়েরা নিয়মিত অভিনয় করতেন। মধুসূদন দত্তের ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৭৩) নাটকে অভিনয় করেছিলেন শ্যামা, গোলাপসুন্দরী, জগত্তারিণী ও এলোকেশী। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের তিরিশ-এর দশক পর্যন্ত থিয়েটারে অভিনয় করতে আসতেন তথাকথিত পতিতাপল্লীর মেয়েরা। পেশাদারী মঞ্চের ইতিহাস নটী বিনোদিনীর মত আরো অনেক নারী—কাদম্বিনী, যাদুমনি, হরিদাসী, রাজকুমারী, গোলাপসুন্দরী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, প্রমুখ তথাকথিত ভদ্রসমাজ চ্যুত বারাঙ্গনাদের প্রতিভা ও নিষ্ঠার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দ্র. আমার বই বং *থিয়েটার ম্যানিফেস্টো থেকে বাজার*, পরম্পরা, কলকাতা, ২০২২। দ্র. *মঞ্চের নারী: সামাজিক প্রতিকূলতার এক জীবন্ত দলিল*, http:ir.nbu.ac.in>bitsream

৭ দ্র. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৭।

৮ সূত্র, শোভা সেন এর সাক্ষাৎকার– An Interview of Ms. Sova Sen, Natyoshodh Sansthan, Kolkata [NSS], Created 19.08.1983, Interviewer Dr. Samik Bandyopadhyay, Dr. Pratibha Agarwal., archieve.org/denai.ncaa.

৯ প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, সম্প্রতিকালে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল যে "Me Too" [2006] মুভমেন্ট, তাঁর সূত্রপাতই হয়েছিল হলিউডের অভিনেত্রীদের যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে।

১০ *See*, Sudhi Pradhan, *The Marxist Cultural Movement in India*, 1936-1947, vol. I, XXII, books.google.co.in.

১১ দ্র. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, পৃষ্ঠা ৪।

১২ তদেব, পৃষ্ঠা ৩।

১৩ Utpal Datta, *Towards A Revolutionary Theatre*, Seagull, Kolkata, 1990, p.82.

১৪ দ্র. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, ভূমিকা এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭।

১৫ তদেব, পৃষ্ঠা ৮।

১৬ দ্র. সাক্ষাৎকার। An Interview of Ms. Sova Sen, *Natya Shodh Sansthan*, 19.08.1983. Inerviewer Pratibha Agarwal, Samik Bandyopadhyay.

১৭ উৎপল দত্ত, *শোভাকে: স্বপ্নবিলাসীর কবিতা*।

Memorials to Sir William Jones

Pronoy Roy Chowdhury
Depty Superintending Engineer, Public Health Engineering Department
Government of West Bengal

Sir William Jones, the famous British Philologist, distinguished Orientalist and Puisne Judge of the Supreme Court of Judicature of Fort William of Bengal, reached India via Crocodile Frigate on 25th September, 1783. Sir Jones was already well known by that time as an astute linguistic prodigy educated at Harrow School and later at University College, Oxford of which he was also elected a Fellow. He was also a Fellow of Royal Society of London. At an early age he already mastered English, Greek, Latin, Persian, Arabic, and Hebrew. He also spoke other European languages such as French, Spanish, and German and later after coming to India, he acquired mastery on Sanskrit and knew the local Bengali and Hindustani languages. In a pursuit to better understand the uncharted knowledge of the people of Asia which was yet shrouded by darkness from European Scholarship, he took initiative for foundation of the oldest learned society of India called 'Asiatick Society' on 15th January, 1784 at Calcutta. Some 30 venerable gentlemen met at the grand jury room of Supreme Court of Calcutta and proposed to form the 'Asiatick Society'.

Sir William Jones, FRS, FRAS, FRSE, Founder President of The Asiatic Society

At the Inaugural address he delivered on the occasion of the founding of the 'Asiatick Society', his opening remarks were worth-documenting. "When I was at sea last August on my voyage to this country, which I had long and ardently desired to visit, I found one evening, on inspecting the observations of the day that India lay before us and Persia on our left, whilst a breeze from Arabia blew nearly on the stern. A situation so pleasing in itself and to me so new could not fail to awaken a train of reflections in a mind, which had early been accustomed to contemplate with delight the eventful histories and agreeable fictions of this eastern world...".

Sir Jones left a huge body of work regarding the antiquity of India. He would study Sanskrit in the most comprehensive

form at Nabadwip located at Nadia District which was then considered as Oxford of Bengal. He was the inaugural President of the 'Asiatick Society' of Bengal since its inception to his passing away in the year 1794. The memorandum of Article of the Society during its foundation was "The bounds of investigations will be the geographical limits of Asia, and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man and produced by nature." Sir William Jones delivered eleven annual discourses at the Society which were most scholarly documents containing scholarly address on history, civil and natural, the antiquities, arts, sciences and literature of Asia. He has worked most comprehensively on the institution of Hindu Law and has published the treaties on Hindu Law based on *Manusmriti*. He translated the *Abhigyan Sakuntalam* of Kalidasa as *The Sancontola or the Fatal Ring*. Due to his consistent efforts it was established before the learned community of the worlds that Sanskrit was one of the oldest of languages known to humanity. His researches even led to obtaining significant knowledge about King Chandragupta of the Mauryan Empire. Sir William Jones through the establishment of the Asiatic Society had most significantly imbibed the spirit of research into the history, science and linguistics of ancient Asia with special reference to India. Sir William Jones during his 11 years stay at Calcutta resided at Garden Reach. From there, he used to come to his official chambers at the Supreme Court during early hours of the day. At his chamber he would study Sanskrit and try to comprehend the vastness of the ancient language of India. This excessive labour may have affected his health as we find subsequently, the same has happened with James Prinsep who passed away only at age of 40 years. Sir John Shore, later Lord Teignmouth who was a close friend of Sir William Jones and succeeded as the President of the Asiatic Society in 1794 and also at the same time Governor General later published the book *Memoirs of the Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones*, where the voluminous work achieved by Sir Jones during his life of only 47 years 7 months has been depicted in vivid details.

During this time the town of Calcutta was surrounded by jungles, marshy land and the drainage was not proper. Both the natives and people of the European Community was often affected with various health problems. The British and the Europeans often found the intense tropical climate of Bengal quiet unbearable. Malarial fever, Asiatic cholera and various other maladies prevailed among the population. Life was relatively short among the population, each year many people belonging to British Community at Calcutta passed away from different diseases. It is found in the book, *Calcutta Past and Present*, written by Kathleen Blechynden, 1905, that on 29th September, 1766 it was discussed, "The present burying ground situated in the middle of the town, is very detrimental to the health of the inhabitants and too much confined: the civil architect is therefore directed to point out a more convenient situation for one to be made of proper dimensions." A year later on August 1767 the new burying grounds were made ready by 25th August. It is found that the first funeral took place when one Mr. Wood, a writer in the Council House was put to rest. These new burying grounds are located at the present day Park Street, the historically well-known North & South Park Cemetery. The grave of late Mr. Wood did not remain a solitary grave for long. The city of the dead soon gathered its occupants. It was recorded the burials of the period was at an average of two hundred a year and monuments were constructed over the grave of the departed souls. When the Park Street Burial Grounds was opened it was surrounded by fields and was located far in the countryside. A road was constructed along the burying ground and outlying hamlets called the burial ground road which is the modern day Park Street. Funerals

in early days of Calcutta was a rather solemn event. No hearses were used to carry the dead. The departed was carried on men's shoulders and a procession of respectable gentlemen followed the body of the departed. This was gesture of solidarity, that the departed was esteemed and cared for while living and lamented after being departed.

The last scene of Sir Jones's life is described below as revealed from the writings of Sir John Shore, and later Lord Teignmouth, in the book *Memoirs of the Life, Writings, and Correspondence, of Sir William Jones*. The wife of Sir William Jones, Lady Anna Maria Shipley, eldest daughter of Bishop of Asaph also accompanied Sir Jones to India. But the tropical climate often caused her to remain indisposed. In a pursuit to regain health she departed for her homeland and Sir William Jones was to follow her within few months as some official duties such as completion of the digest on Hindu & Mohammedan Law only kept him detained in India. But fate had something else in store. Lord Teignmouth delineates the story, "on the evening of the 20th of April or nearly about that dates after prolonging his walk to late hour … complained of aguish symptoms, mentioning his intention to take some medicine, and repeating jocularly an old proverb that, 'an ague in the spring is medicine for a king'." But he was completely without any suspicion about the actual cause of his indisposition which at that point of time was a common problem in Bengal, "inflammation of the liver". As the problem aggravated Doctor Hare was called after 2 or 3 days who diagnosed the ailment. But the disease was advanced too far to yield to the efficacy of the medicine usually prescribed at that time. The disease was terminally fatal and on 27th of April, 1794 he passed away. As reported by Sir John Shore in his book referred above, "…..his bodily suffering from the complacency of his features and the ease of his attitude could not have been severe; and his mind must have desired consolation from those sources where he had been in the habit of seeking it, and where alone in our last moments it can ever be found". It was said that Sir Jones was lying in the bed in a posture of medication. He retired to his closet and expired his last in a posture showing adoration to the creator. Thus ended the eventful life of a rare intellectual talent in a short span of 47 years in which he had acquired a vast knowledge in the field of arts, sciences and languages which shall be seldom equalled and if ever surpassed. The funeral ceremony of Sir Jones was performed the following day.

The book *Calcutta Past & Present*, gives entries in the diary of a citizen of Calcutta, which runs, "April 27th 1784. Received the information that Sir William Jones was no more! I confess it struck me severely, and, in the bitterness of my grief, I almost cursed my own existence to think that such really great and good men as he should be thus snatched away, whilst the wicked and ignorant are permitted not only to walk this planet, but to commit their depredation upon it. Whatever is right!" The entry in the diary went on, "April 28th, At five W and I rode on horseback to the west of the fort, round by the eastward to Chowringhee, where we waited upwards of an hour to see the funeral of Sir William Jones pass by. All the European troops in garrison were there, with clubbed arms."

Again, there is another entry in the diary on 30th April, "In conversation this day with R. about Sir William Jones, whose lamented death lies uppermost in my mind. He told me he had been ill for about a week or ten days (or rather complained of being ill about that period) before his death. Doctor Hare attended him...and found on the right side a tumour as big as his fist. Inquiring when this came he said it appeared about four or five months ago, but that as it came of itself he imagined it would go away in the same manner, and had taken no notice of it, only by way of exercise had walked every

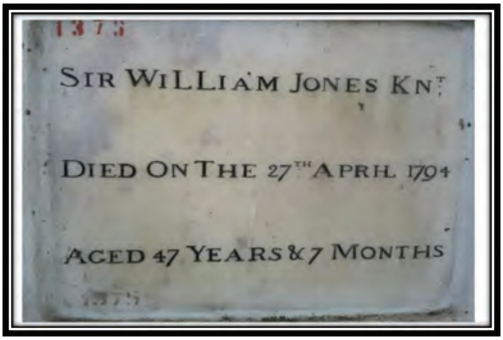

Pic.No.1 The tomb of Sir William Jones at South Park Street Cemetery, Park Street, Kolkata, maintained by The Asiatic Society, Kolkata

day before his carriage to and from the garden upwards of four miles. On being asked if it had not been very painful, he replied that it had been so very severe that he would not go through such another period for all the riches and honours in the world. On hearing this one is tempted to call one "Oh! the weakness of a strong mind!". He said he thought it beneath him to let the mind bend to the pains of the body".

One of the most significant of the monuments in South Park Street graveyard is that of Sir William Jones (refer Pic.No. 1). The epitaph at the tomb of Sir William Jones was composed by himself only a short while before his demise. The Epitaph is unique as it displays the characteristic feature of Sir William Jones, his total resignation to the will of the Almighty Redeemer, love and goodwill to the humanity and modest silence on his intellectual attainments.

The epitaph is reproduced here for the learned reader to appreciate the solemnness of the content.

Epitaph

Here was deposited the mortal part of a man
Who feared God, but not death,
And maintained independence,
But sought not riches; who thought
None below him but the base and unjust,
None above him but the wise and virtuous;
Who loved
His parents, kindred, friends, and country,
With an ardour
Which was the chief source of
All his pleasures and all his pains :
And who, having devoted
His life to their service, and to
The improvement of his mind, resigned it calmly,
Giving Glory to his Creator,
Wishing peace on earth
And with good will to all creatures.
On the twenty-seventh day of April,
In the year of our blessed Redeemer,
One thousand seven hundred and ninety-four.

Pic. No.2 Statute of Sir William Jones holding the treaties of Hindu Law composed on *Manusmriti* at Saint Paul's Cathedral, London

The Court of Directors of the East India Company took a unanimous vote at the court to perpetuate the memory of Sir William Jones by erecting a memorial to him at the St. Paul's Cathedral London, where a statute of Sir William Jones is erected holding the treaties of Hindu Law composed on *Manusmriti* (Pic.No.2)

Lady Jones took an initiative to perpetuate the fame of her departed husband with whom she lived in the closest union of esteem & affection. An elegant monument was erected to the memory of Sir Jones at the expense of Lady Jones in the anti-chamber of the University College of Oxford, sculpted by John Flaxman, having inscription in Latin with an image showing Sir Jones seated transcribing information from the scholars of Hindu and Muslim Law in front of him. A sculpted banana leaf can also be seen referring to his botanical studies conducted while at India (refer Pic.No.3).

The English translation of the Latin verses are reproduced below: –

On 12th June, 1897, a great earthquake took place at Assam. The impact of the earthquake also shook the City of Calcutta. The Tomb of Sir William Jones was affected. *The Memoirs of the Geological Survey of India*, Vol-29, 1899, gives a vivid description of the Tomb of Late Sir Jones, located at North side of old Park Street Cemetery.

"The monument consists of a massive oblong pedestal built of brick, measuring 16 feet 2 inches from East to West and 13 feet from North to South, to 10 feet 3 inches in height, surmounted by a tapering obelisk, also of brick, the original height of which from the ground was 50 feet". The damage to the structure due to earthquake has been indicated, "…The upper 6 feet or so of this has been broken off, and the fragments including a conical stone cap which formed the summit of the obelisk, are now lying at the foot of the pedestal in the south-west side. The longer sides of the monument run E 20^0 S and W20^0 N…"etc.

Sacred to the memory
of Sir William Jones, Knight
who received from his father a name distinguished by learning
and heaped further glory upon that name.
No science was beyond his inborn talents,
which he developed with the utmost diligence in excellent studies.
His naturally virtuous disposition
was thoroughly tested and proven
in the championship of justice, freedom and religion.
Having promoted while alive, by counsel, example and authority
whatever might be foud useful and honourable, he even now preserves and adorns
all of it in his immortal writings.
On the 27 May 1794, at the age of 48,
this utmost distinguished man
was overcome by an attck of illness
while he was preparing to return to his homeland
from the province of Bengal
where for ten years he had fulfilled
with perfect integrity of the office of Judge,
so that his memory might be preserved
above all in that College
in which he had once shone as a Fellow,
Anna Maria, daughter of Jonathan Shipley, Bishop of St. Asaph,
piously erected this honourable memorial
to her husband of blessed memory.

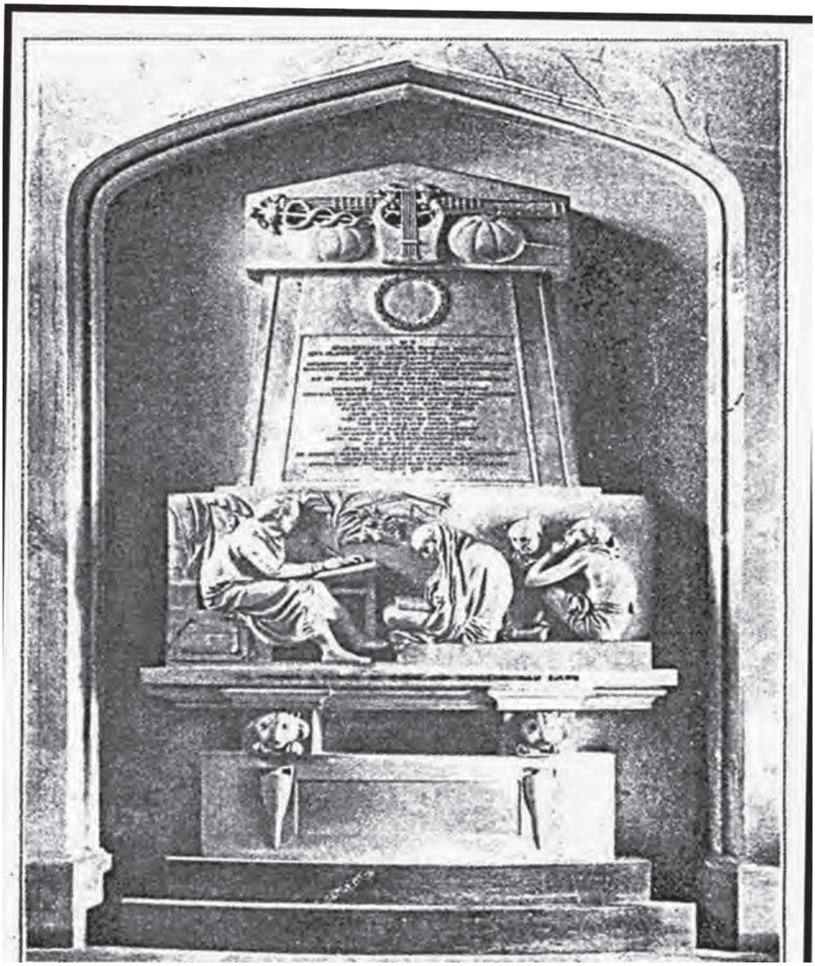

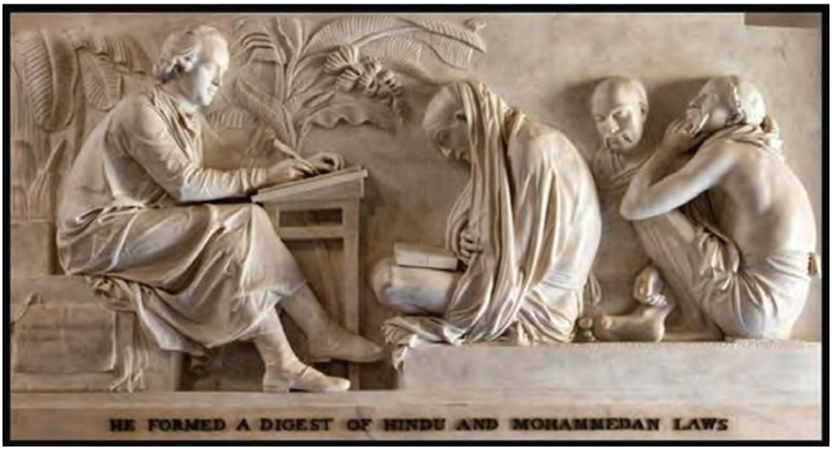

Pic. No.3 Monument erected to the memory of Sir Jones at the expense of Lady Jones in the anti-chamber of the University College of Oxford, sculpted by John Flaxman.

Today the tomb of Sir William Jones is the best maintained tomb in the South Park Street Cemetery, the tomb is in fact maintained by the Asiatic Society which has grown into an Institution of National Importance of the Government of India.

The Asiatic Society has taken many initiatives to perpetuate the memory of its founder Sir William Jones. The bi-centenary of birth of Sir William Jones was celebrated in 1946. A commemorative volume was published at the occasion by the Asiatic Society. In the said volume a message may be found among others from the Oxford University whose Fellow & alma mater was Sir William Jones. The address was in Latin, as Sir Jones wrote "Commentaries on Asiatic Poetry" in Latin,.

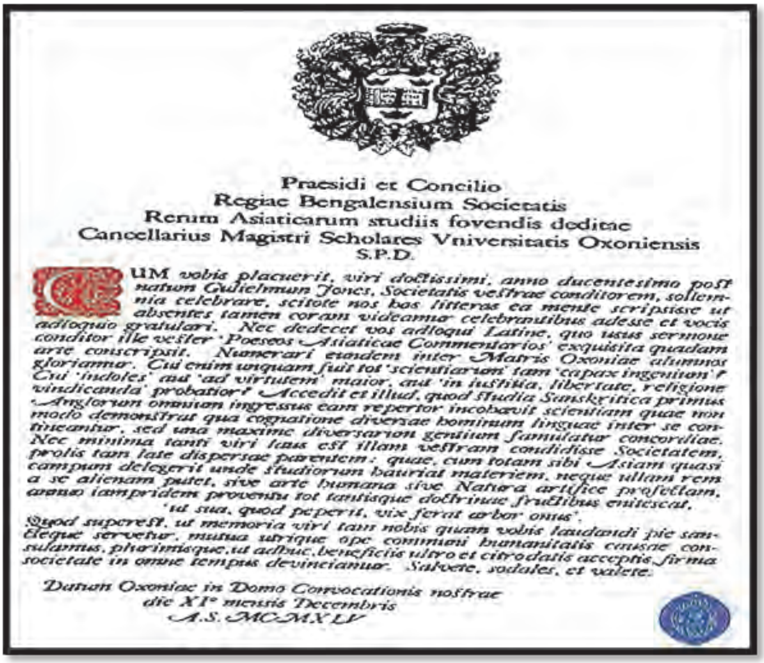

Praesidi et Concilio
Regiae Bengalensium Societatis
Rerum Asiaticarum studiis fovendis deditae
Cancellarius Magistri Scholares Vniversitatis Oxoniensis
S.P.D.

CUM vobis placuerit, viri doctissimi, anno ducentesimo post natum Gulielmum Jones, Societatis vestrae conditorem, sollemnia celebrare, scitote nos has litteras ea mente scripsisse ut absentes tamen coram videamur celebrantibus adesse et vocis adloquio gratulari. Nec dedecet vos adloqui Latine, quo usus sermone conditor ille vester 'Poeseos Asiaticae Commentarios' exquisita quadam arte conscripsit. Numerari eundem inter Matris Oxoniae alumnos gloriamur. Cui enim unquam fuit tot 'scientiarum' tam 'capax ingenium'? Cui 'indoles' aut 'ad virtutem' maior, aut 'in iustitia, libertate, religione vindicanda' probatior? Accedit et illud, quod studia Sanskritica primus Anglorum omnium ingressus eam repertor incohavit scientiam quae non modo demonstrat qua cognatione diversae hominum linguae inter se contineantur, sed una maxime diversarum gentium famulatur concordiae. Nec minima tanti viri laus est illam vestram condidisse Societatem, prolis tam late dispersae parentem: quae, cum totam sibi Asiam quasi campum delegerit unde studiorum hauriat materiem, neque ullam rem a se alienam putet, sive arte humana sive Natura artifice profectam, anno iampridem proventu tot tantisque doctrinae fructibus enitescat,
'ut sua, quod peperit, vix ferat arbor onus'.
Quod superest, ut memoria viri tam nobis quam vobis laudandi pie sancteque servetur, mutua utrique ope communi humanitatis causae consulamus, plurimisque, ut adhuc, beneficiis ultro et citro datis acceptis firma societate in omne tempus devinciamur. Salvete, sodales, et valete.

Datum Oxoniae in Domo Convocationis nostrae
die XI° mensis Decembris
A.S. MCMXLV

"Commentaries on Asiatic Poetry" in Latin.

"The Lord is my ight

To,
The President and Council of the Royal Asiatic Society of Bengal.
From, The Chancellor, The Masters and Scholars of Oxford University
Greetings.

You have decided to celebrate the bi-centenary of the birth of Sir William Jones, the founder of your Society, and we from afar join in your celebrations. To address you in Latin will not be out of place, for it was in that language, handled in exquisite manner, that your founder wrote his "Commentaries on Asiatic Poetry". We are proud to call him an Oxford man, for few indeed can boast such a scholarly trained and broadly cultured mind. He was the first Englishmen to study Sanskrit and it was the privilege to have discovered the science of comparative Philosophy which traces the connection between languages and serves so well the cause of concord among nations.

To have been the founder of your Society a tree with so many offshoots – is not the smallest praise of this great man, the whole of Asia is your field of study, nothing in nature and nothing of human intervention lies beyond your scope; the fruits of your annual harvest are such that the tree can hardly bear its load unbowed.

Let us honour his memory. It is scared to you; it is scared to us, and the cause of mankind will be served by both of us, when by this our mutual exchange we are firmly linked together for all time. Farewell colleagues . . . Given at Oxford in our convocation Hall, the eleventh day of December, in the year of Grace, 1945."

The English version of Commentaries on Asiatic Poetry

Thus we may easily understand even after so many years since Sir William Jones have passed, his spirit pervades in the breast of the learned humanity, bridging them in one thread of scholarly union. It is the legacy of Sir William Jones that the knowledge of Arts & Science of East and West finds brotherly communion with each other.

Acknowledgement:

The books, documents, papers, Bicentenary Publication of The Asiatic Society, The memoirs of Geological Survey of India, and the Memoirs of Sir William Jones etc. which have been consulted for developing this document are acknowledge with deep gratitude.

International Webinar between The Asiatic Society, Kolkata (India) and Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University, Krakow (Poland) in association with Honorary Consulate of Poland in Kolkata (India) on 'Status of Cultivation of Sanskrit as a Language in Poland & India'

The Asiatic Society, Kolkata (India) and Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University, Krakow (Poland) in association with Honorary Consulate of Poland in Kolkata (India) organised an international webinar on 'Status of Cultivation of Sanskrit as a Language in Poland & India' on 6 September 2023 at 1330–1600 Hrs. (IST) / 1000–1230 Hrs. (CET) at the Humayun Kabir Hall of the Asiatic Society, Kolkata.

The session of the programme began with the delivery of Welcome and Introductory Addresses by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of the Society and Mr. Joydeep Roy, Chief Consular Officer, Honorary Consulate of Poland in Kolkata respectively. Mr. Mohan Goenka, Honorary Consul of Poland in Kolkata and Vice Chairman of Emami Group delivered the Welcome Address as the Guest of Honour. The Inaugural Address was delivered by Dr. Sebastian Domzalski, Charge D'Affaires, Embassy of Poland in New Delhi who was the Chief Guest for the said occasion. The Presidential Address was delivered by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Society.

Eminent speakers viz. Professor Halina Marlewicz (Head of the Department of Languages and Cultures of India & South Asia, Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University, Krakow, Poland), Professor Iwona Milewska (Associate Professor, Department of Languages and Cultures of India & South Asia, Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University, Krakow, Poland) and Professor Tapati Mukherjee (Vice President of The Asiatic Society, Kolkata and President of Sanskrit Sahitya Parishat, Kolkata) spoke some words in connection with the theme of the programme. Invited speaker Professor Dr. Shrikant S. Bahulkar (Adjunct Professor, Department of Pali & Buddhist Studies, Sāvitrībai Phule Pune University and Chief Investigator, Bhāgavata Purāṇa Project of Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune) could not attend the programme due to illness. The programme continued further with an interactive Q&A Session moderated by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of the Society concluding with a Vote of Thanks by Professor Asok Kanti Sanyal, Treasurer (Acting) of The Asiatic Society, Kolkata.

লিম্বুয়ানা : হারিয়ে যাওয়া কিরাতভূমি

দীপক নাগ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ কলেজ

কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়টা যেন এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়ি মানুষের অভিভাবক। লিম্বু ও লেপচাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতাদের বাসস্থান। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মে জো ব্রাউন ও জর্জ ব্র্যান্ড সিকিমের রাজা বা চোগিয়ালের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা-শৃঙ্গ অভিযানের অনুমতি চাইলে সিকিমের রাজা শর্তসাপেক্ষে সেই অনুমতি দেন। শর্তটি হল, 'কোনো অবস্থাতেই কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষস্থানে পা দেওয়া চলবে না'। তাঁরা তাঁদের কথা রাখেন। শীর্ষে ওঠার একটু আগেই তাঁরা থেমে যান। আর সেই প্রথা এখনও সবাই মেনে চলছেন। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে এখনও মানুষের পা পড়েনি। ওঁদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা চিরকুমারী। মেঘের শাসন কাটিয়ে জ্যোৎস্নারাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা যখন ঘোমটা খোলে, তখন কে বেশি সুন্দর—কাঞ্চনজঙ্ঘা না পূর্ণিমার চাঁদ — তা ঠিক করা মুশকিল। যেন মেঘবালিকারা সারারাত জ্যোৎস্নায় সাঁতার কাটে। পাহাড়ের ঢালে ঢালে বাস করা মানুষগুলো সবাই যেন রিম্বি পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার স্বপনবাবুর আপনজন। মনে হল এদের টানেই ওঁর আর নিজের সংসার করা হল না। কোনোভাবেই বীরবাহাদুর আর মণিকুমার—লিম্বু জনগোষ্ঠীর এই দুই ভাইকে পাশ কাটানো গেল না। ওঁদের গ্রামের বাড়ি রিম্বিক-এ যেতেই হল। এখনও প্রায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকার মানুষদের সহজ সরল জীবনধারা ও অতিথিপরায়ণতা নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন।

পশ্চিম সিকিমে নেপাল সীমান্তের কাছে 'রিম্বিক' গ্রাম। পেলিং থেকে ৭ কিলোমিটার ওপরের দিকে গেলেই লিম্বুদের গ্রাম 'দরাপ'। দরাপ ছাড়িয়ে সাত কিলোমিটার উঁচুতে উঠলেই রিম্বিক। দরাপের পরেই মূল রাস্তাটা চলে গেছে পেলিং থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে উঁচু পাহাড়ের মাঝে বিশাল জলাধার 'খেচুপেরি' এবং সিকিম রাজ্যের প্রথম রাজধানী 'ইয়োকসাম'-এর দিকে। পাঁচ শৃঙ্গ বিশিষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার একমাত্র পথ এদিকেই।

কথায় কথায় বীর বাহাদুর লিম্বুর কাছ থেকে জানতে পারলাম 'রিম্বিক' কিন্তু এই গ্রামের আসল নাম নয়। লিম্বু শব্দ 'লিং বিট' থেকেই পরবর্তী কোনো একসময়ে রিম্বিক নামে এর পরিচিতি ঘটেছে। গ্রামের পাশ দিয়েই কলকল শব্দে রিম্বি নদীর জল ৭ কিলোমিটারের মতো নিচে রিম্বি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বীর বাহাদুরের বাবা সঞ্চরণের বয়স সঠিকভাবে কারো জানা নেই। ওঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা হিসেব করে সঞ্চরণ জানায় তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে। পাহাড়ের বিভিন্ন ঢালে একটা দুটো করে বাড়ি মিলিয়ে মোট ২২টি বাড়ি নিয়েই এই গ্রাম। রিম্বিক গ্রামের পাহাড়ের একটা ঢালে খুব লম্বা দুটো গাছ এই গ্রামের প্রতীক। গাছদুটোকে গ্রামের সবাই খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সঞ্চরণ নিজেও জানে না গাছদুটোর বয়স কত। জানা গেল তার ঠাকুরদাও নাকি জানতেন না গাছদুটো ঠিক কবেকার। রিম্বিক

রিম্বিকে সঞ্চারণের পরিবারের সাথে।

গ্রামের পর সেংখোলা ও চৌরি নামে আরও দুটো লিম্বু গ্রাম আছে। লিম্বু ভাষায় 'খোলা' মানে গ্রাম। তারপরই নেপাল সীমান্ত। বীরবাহাদুর রিম্বিক স্কুলের বাৎসরিক ম্যাগাজিন *লিংবিট* আমাদের দিল। ওই ম্যাগাজিনটার পেছনেও ওই দুটো গাছের ছবি। ওদের ধারণা ওই দুটো গাছ এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। চলতি কথা অনুযায়ী লেপচারা লিম্বুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য লিং বিট নামের এই দুটো গাছের চারা গ্রামের মানুষদের উপহার হিসেবে দেয়। লেপচা ভাষায় লিং বিট কথার অর্থ 'অনিশ্চয়তা'। তিব্বতের শীতলতম পরিবেশ থেকে আনা গাছ এখানে বাঁচানো যাবে কিনা সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত ছিল না। তাছাড়া আজ থেকে তিনশো বছরেরও আগে ওরকম দুর্গম এলাকায় মানুষের জীবনে সব সময়ই একটা অনিশ্চয়তা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। তোজি ও মনা নামে লিম্বু পরিবারের দুই ভাইয়ের নামে গাছদুটোর নাম। "...জন্তু, গাছকে পূর্বপুরুষ বলে বিশ্বাস" একটা সময়ে গোটা বঙ্গভূমিতেই প্রচলিত ছিল[১]। কথায় কথায় সঞ্চরণ জানাল মাত্র বছর তিরিশেক আগে এই এলাকার মানুষ প্রথম ভাত খায়। তার আগে ভুট্টা, বাজরা বা জঙ্গল থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসা নানা ধরনের গাছের ফলমূল বা শিকার করে আনা জন্তুর মাংস ইত্যাদিই ছিল তাদের মূল খাবার। লিম্বুদের খাওয়া দাওয়ার বিশেষ কোনো বাছবিচার নেই। একসময় পাহাড়ে বিশেষ ধরনের পাথর থেকে নুন সংগ্রহ করতে হতো। তাছাড়া ছিল তিস্তা বাজার। দিন সাতেকের হাঁটা পথে বা ইয়াকে চেপে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে তিস্তানদীর ধারে সপ্তাহে একদিন যে বাজার বসতো — সেটাই এখন তিস্তা বাজার। এই এলাকায় শত শত বছর কাটানোর পরেও লিম্বু ও লেপচারা এখনও নিজেদের অবহেলিত মনে করে। কিরাত জনগোষ্ঠীর মানুষ বলে নেপাল ও সিকিমের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের অবহেলার চোখে দেখে, এবং প্রায় অচ্ছুত বলে মনে করে। তবে এই দুর্গম এলাকাতেও ১৯৬৬ সালে একটা টিনের চালার প্রাইমারি স্কুল সিকিমের রাজা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই স্কুল এখন দোতলা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। 'লিংবিট' নামে স্কুলের বাৎসরিক ম্যাগাজিনটাতে ইংরেজি, হিন্দি ও লিম্বু - তিন ভাষাতেই লেখা ছাপানো হয়। একসময় লিম্বুদের আলাদা লিপি ছিল। সেই লিপিটি এখন আর নেই[২]। মৌরং বা প্রাচীন লেপচা লিপি থেকে লিম্বু লিপির উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। এখনও সেই লিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে[৩]।

ভৌগোলিক বাধা সত্ত্বেও সিকিমের সাক্ষরতার হার কিন্তু খুব প্রশংসনীয়। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার যেখানে ৭৭.০৮ শতাংশ, সিকিমে সাক্ষরতার হার ৮২.২০ শতাংশ। লেপচা, ভুটিয়া, লিম্বু প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক এমনিতে বেশ ভালই। একগোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্কও চালু আছে। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও একটা মিশ্র সাংস্কৃতিক ধারা বয়ে চলেছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা লিম্বুদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করব। লিম্বুরা নিজেদের বলত 'ইয়াকথাং'। অনেকে ইয়াকথুংবা বা ইয়াকথুংমা-ও বলে থাকেন। এর অর্থ হল 'পাহাড়ের নায়ক'। তিব্বতিরা লিম্বুদের বলে 'মন পা' অর্থাৎ পাহাড়ের ধাপে বসবাসকারী মানুষ। আর লেপচারা এদের বলে 'রঙ'। কারণ লিম্বুরা আলাদা আলাদা করে পাঁচ বারে তিব্বত

থেকে এসেছে[৪]। লিম্বু জনগোষ্ঠী সিকিম, নেপাল, আসাম, জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের নানা চা বাগান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাস করলেও উত্তরবঙ্গ লাগোয়া বিহারসহ সারা ভারতেই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

লিম্বুদের কয়েকটি সামাজিক রীতিনীতি

বিয়ে, সন্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু সামাজিক রীতিনীতি আছে। লিম্বুদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের বিয়ের প্রথা চালু আছে : ক) অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিয়ে বা লিম্বু ভাষায় 'মাগিবিহা'; খ) পাত্রীকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে বা 'ছরি বিহা', আর গ) অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করে বিয়ে বা 'জরি বিহা'[৫]। কোথাও কোথাও একটা জরিমানার ব্যবস্থা থাকলেও তা আসলে উৎসব চালানোর খরচে ব্যবহার করা হয়। লিম্বুদের বিয়ে একটু খরচ সাপেক্ষ। কারণ বিয়ের আগে মেয়ের বাবাকে "দাম" দেবার ব্যবস্থা আছে। সন্তান জন্মানোর পরেও একটা অনুষ্ঠান করা হয়। লিম্বুরা সাধারণত মৃতদেহ কবর দেয়। তারপর একটা দিন ঠিক করে খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লিম্বুদের তেরোটি ক্ল্যান বা গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। লিম্বুরা এখনও 'মন' বা প্রকৃতি পুজোয় বিশ্বাস করলেও 'ইউমা' নামে ধর্ম যাজকদের কথা মেনে চলে। দরাপ-এ একটা ইউমার মন্দির আছে। সেখানে কোনো মূর্তি নেই। একজন মহিলা 'ধর্ম-মা' তার দেখাশোনা করেন। জলপাইগুড়ি জেলার কেরন চা বাগানের কাছেও একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্দির দেখেছি। মন্দিরের মধ্যে কেবল একটা বেদিতে কিছু ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর আছে লিম্বুদের কিছু প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। লিম্বুরা বছরে অন্তত একবার ম্যাংগুয়ানা নামক এক দেবতার উদ্দেশে মুরগি বা অন্য পশুবলি দেয়[৬]। দক্ষিণ সিকিমের তিমি-তে সিকিমের একমাত্র চা বাগানেও লিম্বুসহ বিভিন্ন আদিবাসী শ্রমিক কাজ করে। রিম্বি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে স্বপনবাবুর উদ্যোগে লিম্বুদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটা মন্দির তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কালী, শিব ও দুর্গার খোদাই করা মূর্তি রাখা হয়েছে। একজন লিম্বু পুরোহিত মন্দিরের দেখাশোনা করেন। কোথাও কোথাও এখন হিন্দু দেবদেবীর পুজো করলেও লিম্বুরা নিজস্ব পদ্ধতি মেনেই তা করে থাকে। বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এন জি ও এই এলাকায় কাজ করছে। এন জি ও-দের ভূমিকা সবখানে প্রায় একই রকম। মহাভারতের উল্লেখ অনুযায়ী শিব-পত্নী উমা-কে সঙ্গে নিয়ে অর্জুনের বীরত্ব পরীক্ষা করার জন্য কিরাতের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন। লিম্বুরা কিরাতেশ্বর বা অনার্য দেবতা শিব ও ইউমার উপাসনা করে। পর্বতের কন্যা বলেই উমা বা দুর্গার আর এক নাম পার্বতী। নেপালের কাঠমান্ডু এবং দক্ষিণ সিকিমের লেগশিপ বা লেক্সিম-এ কিরাতেশ্বর বা শিবের মন্দির আছে। লেগশিপ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে কিরাত বা শিব, ইউমা বা উমা এবং রামের উপাসনা-মন্দির আছে। লিম্বুদের ইউমা দেবীই সমতলে এসে উমা বা দুর্গায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ সিকিমের নামচির চার ধাম-এ বেশ উঁচু এক কিরাতী যুবকের স্ট্যাচু বা প্রতিমূর্তি আছে। পাশেই কিরাত মন্দির। রাবাংলায় বিশাল বুদ্ধমূর্তি কয়েক বছর হল স্থাপন করা হয়েছে। পেলিং-এর কাছেই ছাঙা ছুলুং-এ পাহাড়ের চূড়ায় ৮.৫ একর জমি নিয়ে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে তৈরি হয়েছে ১৩৫ ফুট উঁচু মন্দিরের চূড়ায় চেনরেজিগ-এর মূর্তি। কাচের স্কাই ওয়াক সহ এটাই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচাইতে উচু চেনরেজিগের মূর্তি। বৌদ্ধধর্মের মানুষেরা চেনরেজিগকে বুদ্ধেরই আর একটা রূপ হিসেবে মনে করে। তাঁর কাছেই তাদের দুঃখের কথা জানায়। চেনরেজিগের মূর্তির চোখদুটি খোলা আর চারটি হাত। দুই হাতে মানুষকে অভয় দিচ্ছেন, এক হাতে কালচক্র এবং আর এক হাতে পদ্ম।

লিম্বুয়ানা : হারিয়ে যাওয়া একটি স্বাধীন রাজ্য

ইতিহাসের অদ্ভুত খেলায় লিম্বু জনগোষ্ঠী এখন সিকিম ও নেপালে তাদের আগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপচারিতায় বোঝা গেল হিন্দুত্ববাদীরা কিরাতীদের নামে নানা ঘৃণাসূচক শব্দ ব্যবহার করে। অনেকটা ভারতের অনেক এলাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীদের যেমন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। এমনকি লিম্বুদের স্থাপিত রাজ্যের নামটাও আজ ইতিহাসের মলাটে ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত লিম্বুয়ানা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এখন লিম্বুয়ানা নেপালের একটা অংশ। হারিয়ে যাওয়া লিম্বু বর্ণমালার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী লেপচা, ভুটিয়া ও লিম্বুদের নিয়ে আমরা খুব একটা চর্চাও করি না। তাই এদের ইতিহাসটাও আমাদের অনেকের কাছে এখনও অজানা। রিজলির[৮] মতে, তিব্বত থেকে প্রথমে আসে 'রঙ' জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। অবজ্ঞাভরে নেপালিরা যাদের নাম দিয়েছে লেপচা বা যারা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। তারপর তিব্বতের 'খাম' থেকে আসে 'খাম-পা' বা 'খাম-বা'গণ - সাধারণভাবে যাদের ভুটিয়া বলা হয়। তারপরেই আসে লিম্বুরা। 'লি' শব্দের অর্থ ধনুক, 'বাউ' শব্দের অর্থ যে ধনুক চালায়। এক কথায় তিরন্দাজ বা শিকারি। নেপালিরাই প্রথমে অবহেলা ভরে এই অংশের মানুষদের 'লিম্বু' বলে ডাকতে শুরু করে।

দুধ কোশী এবং কেন্তির মধ্যবর্তী অঞ্চল বা হগসনের মতে অরুণ কোশী এবং মেচিনদীর মাঝামাঝি জায়গাটা নিয়েই ছিল লিম্বুয়ানা রাজ্য। অরুণনদী থেকে দুধ কোশী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা লিম্বুয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে রিজলে উল্লেখ করেন। লিম্বুরাই নেপালের পূর্বাঞ্চলে শাসন করত। কিরাতী বা নেওয়ার শব্দ 'নেপা' থেকে নেপাল কথাটি এসেছে[৯]। এর অর্থ যারা গরু বা ভেড়ার দেখাশোনা করে। মনে করা হয় ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে গোপালকের একটা গোষ্ঠী এখানে আসে। নেপার সঙ্গে 'গোপাল' বা গোপালকের 'পাল' যোগ করে হয়েছে নেপাল বা গরু অথবা মেষ পালকেরা যেখানে বাস করে। অবশ্য নেপাল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে আরও মতামত আছে। তবে নেপালে 'পশুপতি'-র সঙ্গে পশুপালকের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। অষ্টম শতকের হিন্দু যোদ্ধা-ধর্মগুরু গোরখনাথ তাঁর শিষ্যদের গোর্খা নামে অভিহিত করেন। গুরু গোরখনাথের শিষ্য বাপ্পা রাওয়াল রাজস্থানের মেওয়ার এলাকায় রাজত্ব করতেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে বাপ্পা রাওয়ালের বংশধরদের একটা অংশ বর্তমান নেপালের দিকে অগ্রসর হয়ে কাঠমান্ডু থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে গোর্খা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শা-র নেতৃত্বে এই অঞ্চলের মোটামুটিভাবে ৬০ জন ছোট ছোট রাজাকে পরাজিত করে ১৭৬৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বর্তমান নেপাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পৃথ্বীনারায়ণ নেপালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের গোড়াপত্তন করেন। তিনিই সংস্কৃত ভাষার ওপর ভিত্তি করে সারা দেশে একটাই ভাষা চালু করার ওপর জোর দেন। এক ধর্ম এবং এক ভাষা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে চালু হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অ-হিন্দু বা অন্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা আরও পিছিয়ে পড়ে।

কিরাত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লিম্বুরা ৬-৮ হাজার বছর আগে তিব্বত অথবা ইওনান থেকে বর্তমান নেপালের পূর্বাঞ্চলে আসে। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮০ সালে তারা পশ্চিমাঞ্চলে এসে কাঠমান্ডু জয় করে স্বাধীন লিম্বুয়ানা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা ১২২৫ বছর ধরে নেপালে রাজত্ব করে। কিরাতীদের প্রথম রাজার নাম ইলাম্ব। এই রাজবংশ সাত পুরুষ ধরে নেপাল রাজ্য শাসন করে[১০]। জিতসি অথবা জিতদস্তি ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা। কিরাতী ঘটনাপঞ্জি অনুসারে ৩৪ জন কিরাতী রাজা

লিম্বুয়ানায় রাজত্ব করেন[১১]। গৌতম বুদ্ধ নিজেও ছিলেন একজন কিরাতী রাজপুত্র। নেপালের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি থেকে জানা যায় খ্রীস্টপূর্ব ২৫০ সাল নাগাদ সম্রাট অশোক বর্তমান নেপাল বা প্রাচীন লিম্বুয়ানা রাজ্য পরিদর্শন করেন[১২]। নেপালের অন্তর্ভুক্ত অন্য রাজ্যগুলোকে যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। কিন্তু লিম্বুয়ানাই হল একমাত্র রাজ্য যেখানে লিম্বুয়ানার দশ রাজার সঙ্গে গোর্খা-লিম্বুয়ানা চুক্তির ভিত্তিতে নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই চুক্তির শর্তই ছিল লিম্বুয়ানা রাজ্য নেপালের রাজা এবং তাঁর পতাকাকে স্বীকার করে নেবে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সে স্বাধীন রাজ্যের মতোই তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু দিনে দিনে চুক্তির শর্ত হারিয়ে যায়। লিম্বুদের রাজ্য লিম্বুয়ানা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। লিম্বুদের সঙ্গে তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের শুধুমাত্র জাতিগত বা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ছিল না। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চুক্তি অনুযায়ী লিম্বুরা জমিজমার ক্ষেত্রে ‘কিপাত’ নামে এক ধরনের বিশেষ অধিকার ভোগ করত। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা তার তোয়াক্কা না করে সহজ সরল লিম্বুদের ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে এবং আরও নানাভাবে ঠকিয়ে লিম্বুদের জমি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। লিম্বুরা হিন্দু ব্রাহ্মণদেরকে ‘অসৎ’ ও ‘প্রবঞ্চক’ হিসেবে ভাবতে শুরু করে[১৩], তবে আবার অর্থনৈতিক কারণেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লিম্বুয়ানায় ক্রমশ আদিবাসী সমাজের বাইরের বিশাল সংখ্যক সাধারণ জাতির মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে লিম্বুরা তাদের সংখ্যাধিক্য হারিয়ে ফেলে। স্বাধীন লিম্বুয়ানা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে।

সিকিম ও কিরাত জনগোষ্ঠী

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা ও নেপালের কিছু অংশ নিয়ে আয়তনে এক সময়ে সিকিম ছিল বিশাল এক স্বাধীন রাজ্য। বর্তমান সিকিম রাজ্যের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৬৫ কিলোমিটার। চারটি মাত্র জেলা। পুব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চার দিক নির্দেশ করে জেলাগুলোর নাম। ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী সিকিমের জনসংখ্যা মাত্র ৬,১০,৮৭৭ জন। অষ্টম শতকের আগে সিকিমের ইতিহাস সম্বন্ধে খুব একটা জানা যায় না। সিকিম গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, নায়ং, মন ও চ্যাং — এই তিন গোষ্ঠীর মানুষেরাই সিকিমের আদিবাসী। পরবর্তী সময়ে লেপচারা এসে এদের জায়গা দখল করে নেয়। ওরা আরও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। লেপচারা এই এলাকার নাম দেয় নিয়ে-মায়ে-এল বা ভূস্বর্গ। তারপর আসে ভুটিয়ারা। তারা এর নাম দেয় ‘রেনজঙ’ অথবা ‘দেন জঙ’। তিব্বতি ভাষায় এর অর্থ ‘ভ্যালি অফ রাইস’ বা ‘ধানের উপত্যকা’[১৪] লিম্বুদের ইতিহাস অনুযায়ী সিকিম নামটি এসেছে লিম্বু শব্দ ‘সু-হিম’ থেকে। যার অর্থ সুখের বাড়ি বা নিজের বাড়ি। সু হিম থেকেই হয় সু খিম। তারপর ইংরেজদের দৌলতে সু খিম হয়ে যায় সিকিম। দ্বিতীয় চোগিয়াল তেনসুং নামগিয়াল নেপালের এক গোষ্ঠী প্রধানের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং তার মেয়েকে বিয়ে করেন। দেনজঙ বা বর্তমান সিকিমে আসার পর নতুন রানির এই জায়গাটি খুব ভালো লাগে। সু হিম তাঁরই দেওয়া নাম।

১৬৪১ সালে তিব্বত থেকে আসা তিনজন বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বা লামা ফুন্টসং নামগিয়াল-কে সিকিমের প্রথম রাজা বা চোগিয়াল হিসেবে অভিষিক্ত করেন। পেলিং থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে ইয়োকসামের এক গাছের তলায় এই রাজ্যাভিষেক হয়। পাথরের সিংহাসনটি এখনও সুরক্ষিত আছে। লেপচা ভাষায় চোগিয়াল কথাটির অর্থ হল ‘ভগবানের দূত’। ইয়োকসামই সিকিমের প্রথম রাজধানী। তারপর তার বংশধর তেনসুং নামগিয়াল নিরাপত্তার করণে ১৬৭০ সালে রাজধানী পেলিঙের কাছে রামডেনস-এ স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৬ সালে ভুটান সিকিমকে

ইয়োকসামে ১৬৪১ সালে প্রথম রাজা নামগিয়াল-র রাজ্যাভিষেক স্থল

আক্রমণ করে। ১৭১৭ সালে সিকিমকে আক্রমণ করে নেপাল। আবার নিরাপত্তার কারণে চোগিয়াল রাজধানী আরও পুবদিকে সরিয়ে নিয়ে টামলং-এ চলে আসেন। ১৮৩৫ সালে সিকিম ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ১৮৯৪ সালে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে প্রায় ৩০০ বছরের নামগিয়ালদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭৫ সালে সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অষ্টম শতক থেকে সিকিমের আদি বাসিন্দা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেপচাদের নথিভুক্ত ইতিহাসের খোঁজ মেলে। শান্তিপ্রিয় লেপচারা জঙ্গলের গাছপালা বিশেষ করে ভেষজ উদ্ভিদ বা ওষধি গাছ সম্বন্ধে ছিল বিশেষজ্ঞ[১৫]।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বলতে কী বোঝাত মহাভারতের ভীষ্মপর্বে তার উল্লেখ আছে। ধৃতরাষ্ট্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে চাইলে সঞ্জয় ভারতবর্ষের দুই শতাধিক রাজ্যের নাম করেন। সিন্ধু, কাশ্মীর, কেরল, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, অঙ্গ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ, চিন, কাম্বোজ, পারসিক ইত্যাদি রাজ্য ছাড়াও তিনি কিরাত রাজ্যের নাম উল্লেখ করেন[১৬]।

লিম্বুরা কিরাত জনগোষ্ঠীরই একটা অংশ এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ভারতীয়দের আদিপুরুষ নানা সময়ে, নানা ভাগে, নানা দিক থেকে এখানে প্রবেশ করেছে। প্রথমে আসে 'নিগ্রোয়েড', তারপর একে একে আসে 'অস্ট্রিক', দ্রাবিড়, আর্যরা। আর্যদের পরে আসে মঙ্গোলীয়রা। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এইসব জনগোষ্ঠী ভারতে বসবাস করছে[১৭]। তবে মঙ্গোলীয়রা চিন বা তিব্বতের দিক থেকে এসে হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। হিমাচল সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে সিকিম, নেপাল, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ইত্যাদি ভারতের মূলত পাহাড়ি এবং তরাই অঞ্চলে বসবাস করা আরম্ভ করে। খ্রীস্টপূর্ব একহাজার বছরেরও অনেক আগে ভারতে এলেও পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসবাসের ফলে মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে ভারতের অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষের খুব একটা সংমিশ্রণ ঘটেনি। তাই চোদ্দ শতকের আগে ওদের নিয়ে খুব একটা আলোচনাও হয়নি। 'কিরাত' একটি সংস্কৃত শব্দ। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন কিরান্তী নামে পূর্ব নেপালে তিব্বতি-বার্মিজ গোষ্ঠীর মানুষদেরকে সংস্কৃতে কিরাত বলা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে কিরাতী বলতে পূর্ব হিমালয় প্রদেশ, ভুটান, সিকিম, মণিপুর সংলগ্ন অঞ্চলের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কিরাত

ম্যাকডোনাল্ড ও কিথ তাঁদের বিখ্যাত বৈদিক সূচিপত্রে কিরাত সম্বন্ধে বলেন : কিরাত বলতে এমন সব মানুষদের বোঝায় যারা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করে। প্রথমে পূর্ব নেপালে বসবাসকারীদের কিরাত বলে উল্লেখ করা হলেও পরবর্তী সময়ে পাহাড়ে বসবাসকারী সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকেই কিরাত নামে ডাকা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিরাতদের সম্পর্কে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে খুব নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হলেও কোথাও কোথাও আবার এদের ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে যখন কোনো অনার্য বা বিদেশি গোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয় মনে করা হয়, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে,

সেই গোষ্ঠী উন্নত সভ্যতা বা সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই এদের নানাভাবে বদনাম করা হলেও 'বর্বর' হিসেবে অবহেলা করা হয়নি। তবে সংস্কৃত কিরাত-তিক্ত দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় 'চিরইতা' হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্তমানে আমরা তাকে চিরতা বলে জানি। চিরতা কিরাতদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো ওষুধের নাম হতে পারে, আবার কিরাত জনজাতির মতো তেতো বা নীচ বলেও বোঝানো হতে পারে[১৮]।

কিরাতদের সঙ্গে মঙ্গোলীয়দের সম্পর্ক সম্বন্ধে সিলভাঁ লেভি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন[১৯]। কিরাত শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় শুক্ল যজুর্বেদের ৩০ অধ্যায়ে। সেখানে গুহার সঙ্গে কিরাতকে যুক্ত করা হয়েছে। *বাজসনেয়ী সংহিতা* ও *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ কিরাতদের উল্লেখ আছে। *অথর্ববেদ*-এ পাহাড়ের খাদে ওষুধ সংগ্রহকারী কৈরাতিকা বা কিরাত যুবতীদের কথা বলা হয়েছে (১০,৪,১৪)।

মহাভারতের ১৮টি পর্বের মধ্যে ১১টি পর্বে অন্তত ২৬ বার কিরাত প্রসঙ্গ এসেছে। আদিপর্বের ১৭৫ অধ্যায়ে এক পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ করে কিরাতসহ অন্যান্য জাতি বা দেশের জন্ম কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া সভাপর্ব (৪,২৫,২৯ ও ৩১), বনপর্ব (৩৮, ৫১, ৯০, ১৪০), উদ্যোগপর্ব (১৮,৬৩,১৯৫), ভীষ্মপর্ব (৯,২০,৫১), দ্রোণপর্ব (৪,১১২,১১৯), কর্ণপর্ব (৭৪), স্ত্রীপর্ব(২৩), শান্তিপর্ব (৬৫,২০৭), অনুশাসনপর্ব (১৪,৩৫), আশ্বমেধিকপর্ব (৩০,৮৩) প্রভৃতি পর্বে কিরাতদের নিন্দা বা প্রশংসা করা হয়েছে। কোথাও যেমন তাদের অনার্য, বর্বর ও নীচ জাতি হিসেবে নিন্দা করা হয়েছে। তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাদের সৌন্দর্য ও সাহসিকতার প্রশংসা করা হয়েছে। আবার তারা যে এক সময় ক্ষত্রিয় সমাজের অংশ ছিল অনুশাসনপর্বের ৩৫ অধ্যায়ে তারও উল্লেখ আছে। স্ত্রীপর্বে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলছেন, "ঐ দেখ, পর্বতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদ উহাকে ভক্ষণ করিতেছে। উহার কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার উজ্জ্বলপ্রভায় কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জুনের সহিত উহারও তদ্রুপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ওই মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণসংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন"[২০]।

বাল্মীকি রামায়ণ-এ কিরাতদের সুন্দর চেহারার বর্ণনা করে বলা হয়েছে : "পুরুষাশী[২১]। রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর"[২২]। বাল্মীকি কিরাতদের 'পর্বতবাসী' না বলে 'দ্বীপবাসী' বলেছেন।

মনুসংহিতা-য় ক্ষত্রিয় কিরাতেরা কেন শূদ্রত্ব লাভ করেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে : "পৌণ্ড্রক, ঔড্র, কাম্বোজ, যবন, শক, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের কর্মলোপ হওয়ায় শূদ্রত্ব লাভ করেছেন"[২৩]।

মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* কাব্যে হিমালয়ের অসামান্য রূপের বর্ণনা করে বলেন: "এই হিমালয়ে বিগলিত তুষারধারায় রক্তচিহ্ন মুছে যায় তাই কিরাতেরা গজহত্যাকারী সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পায় না — না পেলেও, নখের ফাঁকে খসে-পড়া মুক্তা দেখেই তারা সিংহের গতিপথ ঠিক করে নিতে পারে"[২৪]।

বাংলা সাহিত্যেও কিরাতদের প্রসঙ্গ এসেছে। *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*-এ কিরাতদের সম্বন্ধে বলা হয় :

> ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ।
> মন্দর পর্বতে যেও কিরাতের দেশ।।
> যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বীপে।
> জানিবা কিরাত আছে অত্যদ্ভুত রূপে।।
> কণকচাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
> উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ।।[২৫]

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কিরাতদের সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার উল্লেখ আছে :

কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি সহে কেহ ভার।।[২৬]

এ থেকেই বোঝা যায় পাহাড় সংলগ্ন অবিভক্ত বাংলায় দীর্ঘদিন ধরেই কিরাত সংস্কৃতির একটা প্রভাব রয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গে কিরাত জনজাতির লিম্বু, টোটো, মেচ, রাভা, গুরুঙ ইত্যাদি অন্তত পঁচিশটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে।

ভারতের মাটিতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা খুঁজে পাননি[২৭]। তাই নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, ভারত উপমহাদেশের সব মানুষই বহিরাগত। কেউ আগে এসেছে আর কেউ পরে। আর্যরা এদেশে আসার আগেই যারা ভারতে এসেছে বা কয়েক হাজার বছর ধরে বসবাসকারী অনার্যদের সঙ্গে মূলত এলাকা বা সম্পদ দখল নিয়ে আর্যদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মনে করা হয় আর্যরা ছিল যাযাবর প্রকৃতির। ভারতে আসার সময় তারা চাষের কাজ জানত না। কিন্তু তারাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারে। তার ফলে তারা ঘোড়াকে ব্যবহার করে একের পর এক যুদ্ধে কৃষিকাজে অভ্যস্ত অনার্যদের পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। অনার্যরা দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধবন্দিদের আর্যরা ক্রীতদাস হিসেবে নিজেদের কাজে লাগায়। মঙ্গোলীয় বা কিরাতগণ পাহাড়ি এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পাহাড়ি অঞ্চলেই দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে। পাহাড়ি এলাকায় ঘোড়া দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। তাছাড়া কিরাতরাই প্রথম হাতিকে পোষ মানাতে পারে[২৮]। তাই আর্যরা 'বীর' কিরাতদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাইত না। আর্যরা পাহাড়ি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। এমনকি মোগলরা পর্যন্ত নেপাল, সিকিম ইত্যাদি পাহাড়ি এলাকায় নিজেদের দখলদারী করার খুব বেশি চেষ্টা করেনি। আঠারো শতকে নেপালে হিন্দুত্ববাদী শাসন বা 'নেপালিকরণের'[২৯] ফলে নেপাল ও সিকিমে শান্তিপ্রিয় কিরাতগণ ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু সিকিমে কিরাত জনজাতি গোষ্ঠী এখন আর অবহেলিত নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছে। সামাজিকভাবেও আত্মমর্যাদার জায়গা তারা ফিরে পাচ্ছে। এটা প্রমাণিত যে, ভারতীয় সভ্যতায় কিরাত বা ইন্দো-মঙ্গোলীয়গণও অনেক অবদান রেখেছেন। বুদ্ধের অহিংসার বাণী সারা পৃথিবীকেই প্রভাবিত করেছে। হিন্দু বা বৈদিক আর্যদের ওপরেও যে অনার্য বা কিরাতদের প্রভাব পড়েছিল পাণ্ডবদের জীবনযাত্রার বিশ্লেষণেও তার প্রমাণ মেলে। পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করার ব্যাপারটা আসলে তিব্বতি-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন[৩০]। সিমলা বা কিন্নর অঞ্চলে মেয়েদের বহুগামী প্রথা বা সব ভাই মিলে একজন মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়টা রাহুল সাংকৃত্যায়নও তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করেছেন[৩১]। কৃষ্ণ বাসুদেবের মা দেবকী ছিলেন একজন অসুর রমণী। *মহাভারত* রচয়িতা ব্যাসদেবের মা সত্যবতী ছিলেন একজন দাস কুমারী। পাণ্ডবদেরও কিন্তু পিতৃপরিচয় আলাদা আলাদা। অর্জুন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিলেন। ভীমের প্রথম স্ত্রী হিড়িম্বাও ছিলেন অনার্যা বা রাক্ষসী। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশেই তিনি হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি শুধুমাত্র আর্যদের অবদানেই তৈরি হয়নি। কিরাত বা ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীসহ সমস্ত অনার্যদের অবদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ভারত-তীর্থ'-তে বলেছেন :

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
  হেথায় দ্রাবিড় চীন

শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

এটাই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র। অনেকে মনে করেন, 'অনার্য' ছাড়াও 'চীন' কথাটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কথাই বুঝিয়েছেন। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য – এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। ভারতীয়রা সবাই তথাকথিত বহিরাগত। কে আগে এসেছে আর কে পরে—-তা এখন অপ্রাসঙ্গিক।

টীকা

১ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *বাঙ্গলার ইতিহাস*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ: ৩১।

২ ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, *দ্য লিম্বুস-এ সাউথ ইস্টার্ন হিমালয়ান কিরাত পিপল*, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১,পৃ: ২২।

৩ তপন চট্টোপাধ্যায়, *লেপচাজ অ্যান্ড দেয়ার হেরিটেজ*, বি আর পাবলিশিং করপোরেশন, দিল্লি, ১৯৯০, পৃ: ১০।

৪ প্রমোদ নাথ, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পরিচয়*, এন ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ: ৩১।

৫ ড. চারুচন্দ্র সান্যাল: *ওই*, পৃ: ৩৬।

৬ ফিলিপ স্যাগান্ট, *দ্য ডোজিং শামান*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, ১৯৯৬, পৃ: ১২২।

৭ কালীপ্রসন্ন সিংহ; *মহাভারত*, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৪, খণ্ড ২, পৃ: ৪৩।

৮ এইচ এইচ রিজলি: *গেজেটিয়ার অফ সিকিম*, ১৮৯৪।

৯ ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, *ওই*, পৃ: ১৭।

১০ ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, *ওই*, পৃ: ১৮।

১১ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *কিরাতজন কৃতি*, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৮, পৃ: ১৮৩।

১২ সিলভা লেভি, *নেপাল হিস্টোরিকাল স্টাডি অফ এ হিন্দু কিংডম*, খণ্ড ১, পৃ: ৬০।

১৩ লায়োনেল ক্যাপলান - *ল্যান্ড অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন ইস্ট নেপাল - এ স্টাডি অফ হিন্দু-ট্রাইবাল রিলেশনস*, রাউটলেজ অ্যান্ড কেগান পল, ১৯৭০, পৃ: ৩৬-৩৭।

১৪ *দ্য গেজিটিয়ার অফ সিকিম*, সম্পাদনা: গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, ১৮৯৪।

১৫ অ্যালিস কেন্ডাল, *সিকিম – দ্য হিন্দু কিংডম*, ডাবল অ্যান্ড কোম্পানি, গার্ডেন সিটি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃ: ৩৬-৩৭।

১৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ : *মহাভারত*, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৭৫, খণ্ড ৩ ,পৃ: ১৯১।

১৭ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *ওই*, পৃ: ২।

১৮ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *ওই*, পৃ: ২৭-৩০।

১৯ *নেপাল, হিস্টোরিকাল স্টাডি অফ এ হিন্দু কিংডম*, প্যারিস, ১৯০৫।

২০ কালীপ্রসন্ন সিংহ, *ওই*, খণ্ড ৫, স্ত্রীপর্ব, পৃ: ১৬।

২১ নরখাদক

২২ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাল্মীকি রামায়ণ* (গদ্যানুবাদিত), তুলি কলম, ১৯৮৪, পৃ: ৪৮৭।

২৩ চৈতালী দত্ত, *মনুসংহিতা* (ভাষান্তর), নবপত্র প্রকাশন, ২০১৫, পৃ: ২৫০ (১০,৪২-৪৪)।

২৪ *কালিদাস সমগ্র*, সম্পাদনা জ্যোতিভূষণ চাকী, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ: ২১,(১,৬)।

২৫ কৃত্তিবাস-বিরচিত *রামায়ণ*, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃঃ ১৬৪।

২৬ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *সচিত্র কবিকঙ্কন চণ্ডী*, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯২১, পৃ: ৬০।

২৭ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *ওই*, পৃ: ৬।

২৮ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *ওই*, পৃ: ৬৩।

২৯ এস কেন্ডাল, সি স্যালিসবারি, ই স্যালিসবারি, *মাউন্টেনটপ কিংডম*, নরটন অ্যান্ড কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১,পৃ: ২০।

৩০ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, *ওই*, পৃ: ৬৩।

৩১ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *কিন্নর দেশে*, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৪, পৃ: ৬৭।

Professor Jyotsna Chattopadhyay delivering the Lecture.

Celebration of 203rd Birth Anniversary of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar

On the occasion of 203rd Birth Anniversary of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, a Special Lecture was organised by The Asiatic Society, Kolkata on 26.09.2023. Professor Jyotsna Chattopadhyay, Department of Bengali, Rabindra Bharati University delivered a lecture titled, 'Vidyasagar O Betal Panchabingshati'.

The programme was inaugurated by Dr. Satyabrata Chakrabarti, the General Secretary, following which a brief introduction to the theme was provided to the audience by Dr. Tapati Mukherjee, the Vice-President. This was followed by an enlightening lecture which dealt with multiple versions of the text and their significance.

Coup Cinema, Chile Chapter

Vidyarthy Chatterjee
Veteran Film Critic

(This article is in sad and solemn observance of the 50th anniversary of the coup in Chile on September 11, 1973.)

"Only if you are able to recognize yourself in the past is it possible to come to terms with the present. Personally, I have always believed that a country which does not have a past, can have neither a present nor a future." – Miguel Littin

Soon after usurping power, the Chilean dictator General Augusto Pinochet ordered the killing of all those who were opposed to his rule. 'Operation Condor' was the name given to the plan to liquidate dissidents. As a result, during his reign of terror (1973-90), thousands of Chilean men and women were murdered. As is to be expected, even after so many years the scars of that period have not healed. On May 27, 2008, a Chilean court ordered the arrest and trial of at least a hundred members of Pinochet's dreaded secret service. The court's pronouncement was of a piece with the decision by Spanish legislators in 2007 that the crimes of the Franco regime were to be exposed and the memory of his victims rehabilitated. It is common knowledge that for many a Latin American dictator who held his country and people to ransom from the '60s to the '80s – from Chile and Argentina to Brazil and Paraguay – the infamous Franco served as role model. These recent interventions by the judiciary or the legislature go to show, if anything, that the wheels of history – call her faithful wife, wayward whore, aseptic nun or anything else that comes to mind – move slowly, but they move all the same. It is a different story that many of us seem unaware of this inscrutable movement of time and tide towards deliverance of justice.

Ricardo Larrain Pineda's *La Frontera* (The Frontier) was a Berlin Silver Bear winner in 1992. Set in the last years of the Pinochet regime, the film tells the story of a mathematics teacher arrested for signing a petition for the release of a jailed activist-colleague and sentenced to banishment. Ramiro Orellana, the teacher, is brought to a barren, gloomy place in a cold and rainy coastal district which, during a period of a hundred years, had known two spring tides and several earthquakes causing massive destruction. The inhabitants are mostly of Indian descent and, as a result of their isolation, appear to have nothing in common with modern times. When the teacher first steps into this world of contradictions, he is, at best, half-baked in his understanding of the social and

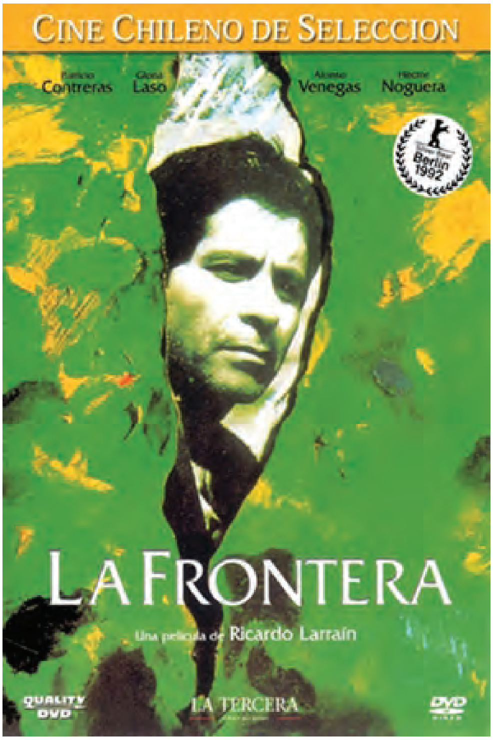

political realities of his country. But an intense relationship with a local woman, difficult and doomed to failure; friendship with a variety of characters in his place of exile; and, finally, a third destructive tide, combine to complete his education about what he should do in the given order of things. When democracy returns on faltering feet and Orellana is told that he is free to return to his home in Santiago, he tells a visiting television crew that he wants to stay where he is.

More avowedly political than some other equally well-known specimens falling under the generic heading of 'Coup Cinema', Chilean chapter, *La Frontera* however also exhibits dream-like qualities while tackling with the theme of exile and estrangement as indeed of repair and reconstruction. The influence of the documentary is in evidence throughout the film and it is an exciting experience to watch the stylistic freshness that the director employs to relate a story of buried emotions and human dramas; of frustrations and fulfilments that combine to give life a renewed chance.

Though not in the same class as *La Frontera*, Leonardo Kocking's *La estacion del regreso* (The Return Stop) is nonetheless a worthwhile addition to the ever-growing body of Chilean cinema examining the theme of separation and wounded loyalties; of a turbulence of the soul and its tragic victims. In this case, the victims are Paula, a primary school teacher, and her absent activist-husband who is arrested and kept confined in a remote and isolated place in the northern desert. The film is about Paula's long and lonely search as much for her husband as for herself in personal, political and philosophical terms. On reaching the desert of her husband's confinement, she

realises that she must start on another to finally find him.

Few Chilean filmmakers have so consistently and painstakingly probed the individual psyche in a state of laceration as Gonzalo Justiniano. Like Miguel Littin or the documentarian Patricio Guzman, Justiniano spent many years in exile outside his country in that eyeless era when Pinochet's jackboots held sway. Justiniano's *Sussi* is a symbolic figure used by the director to bring out the contradictions in a society with totalitarian tendencies. Her relationship with a mysterious lodger at her rooming house and the exertions of her advertising bosses to project her as an ideal Chilean woman (reminiscent of Pinochet's slogan, "For god, nation and the family") in a campaign for a line of champagne, softly underline the twin realities of dissent and decadence in a society caught in the throes of change and resistance to it. The film's unresolved ending, in a slow dissolve, is rich with contradictory meanings.

In *Amnesia,* Justiniano does not name the country where the plot is situated, but it is obvious that he is pointing to the consequences of Chile's nightmarish brush with history. Using a distinctive personal style leaning on black comedy, Justiniano deals with issues terribly close to the daily experience of many Chileans even so many years after the coup – issues like the urge for revenge, or the need to forget and get along.

From the bus on his way home, Ramirez spots Zuniga, his former army officer and sadistic persecutor. Ramirez was a private and serving at a prison camp for opponents of the junta. Ramirez cannot forget how Zuniga ordered him to shoot prisoners, how he shot a pregnant inmate without batting an eyelid. Now, having tracked him down, they reminisce about the past in a local bar. Can the private forgive? Can he give up the idea of revenge that he has planned for so many years? *Amnesia* throws up such questions with sadness and a maturity without which the survivors of the 17-year outrage would perhaps go mad.

Justiniano: "*Amnesia* is a film to counter general amnesia…In today's Chile there are people who don't want to remember anything, starting with those who were involved in dreadful crimes against human rights, upto and including people who demonstrated an enormous lack of political responsibility." Obviously, such a film speaks for practically every Latin American country that has known prolonged military intervention.

Miguel Littin, who was particularly close to President Allende and narrowly escaped death after the coup, made a film with autobiographical undertones in 1993 called *Los naufragos (Shipwrecked)*. Aaron, the film's protagonist, returns to his country after twenty years of exile. He is searching for "a lost nation, a lost understanding, and his lost ties with those who stayed behind". He enters the house where he spent his childhood, negotiating uncertainly but full of yearning, dark corridors and winding staircases. His search for his father and brother is also an inner search for his own self. The collective amnesia that Justiniano speaks of is also dwelt upon by Littin whose *El Chacal de Nahueltoro* (The Jackal of Nahueltoro), made in the first flush of popular enthusiasm for the ideas and ideals of the redoubtable Allende, was among a bunch of pioneering films that drew sharply the battle lines between progressive forces and opposing conservative elements.

Silvio Caiozzi's *La luna en el espejo* (The moon in the mirror), to which many a toast was raised at the Venice film festival in 1990, is a stunning achievement where art and politics seamlessly fuse to produce a mosaic of individual restiveness. Telling an excruciating love story with a thematic backdrop of physical and psychological authoritarianism, *La luna* is an indirect indictment of military rule. On the surface, the film is about three people in search of

love in a magical harbour of twinkling lights and long shadows. In the legendary port of Valparaiso, associated with the revolutionary moments and memories of one Pablo Neruda and a thousand of his votaries, an old and sick sailor, Don Arnaldo by name, lives cooped up in his house of rickety wooden steps and a long rope substituting for a handrailing, with his son El Gordo, or Fatty, as his only companion. Reflecting shades of Pinochet and his ubiquitous spies, Don Arnaldo observes everything that happens in the house from his bed, thanks to a series of mirrors of varied descriptions hung on the walls of the house. Fatty is obedient and loving after a fashion, but he is also afraid and desperately wants to be free. Perhaps, he even desires the withering away of his old father, a sentiment that he does not allow to grow after a point, thanks to a strong sense of guilt.

Lucrecia, played with the right touch of subdued emotions and a vulnerability that could be construed as a cloak to cover up amorous ambitions by Gloria Munchmeyer who won the best actress award in Venice, is Fatty's neighbour, a widow slightly older than him. They are secretly in love, a fact they fearfully hide from the watchful eyes of Don Arnaldo. But, once in a while, Fatty's enthusiasm causes him to defy the cloistered life imposed on him by his father; one day he goes for a walk with Lucrecia in the bay area, another day he does something else. His repeated acts of rebellion exasperate Don Arnaldo who plays his last card one cold dark night to regain control over his son. But to no avail, for the son (read 'nation' or 'the people', if you will) has at long last come of age. He has belatedly realised that there ought to be more to his life than changing the old man's crumpled bedclothes, giving him a shave every other day, cleaning his potty, preparing his onion soup and keeping him in general good humour.

In philosophical terms, *La luna* is about a lost threesome in search of love at a time of lovelessness clamped on one and all by orders from above; a love constantly tested and threatened and, thereby, rendered into no more than a memory or a mirage both wonderful and untrue. Combining the literary vision of Jose Donoso with the interpretative skills of Silvio Caiozzi, *La luna* gave life to a profound, saddening, many-layered encounter between these elusive creatures. At the same time, a lesson pregnant with political insight is conveyed to move and elevate the viewer. Together, the writer and the filmmaker converted an entire nation's experience of regimentation and repression into a private journey through dark shadows and the burning desire to move to light. Truly, this is the kind of film that sustains the flickering flame of faith in cinema as a potent vehicle of artistic, aesthetic and intellectual expression, but also in the destiny of Man who must struggle simultaneously against both himself and outside odds before he can realise fulfilment in some measure.

Donoso was Chile's representative in the Latin American literary renaissance that raged like a fire all through the world, especially in the last quarter of the 20th century. Though not as well-known internationally as Marquez or Vargas Llosa, Donoso, who died some years ago, was regarded in his own country, as indeed in the rest of the Spanish-speaking continent, as a formidable talent capable of truly great things. His capacity to invoke images pulsating with passion and smelling of a certain quality of embittered rawness endeared him to generations of readers, topped by fellow-artists of stature. Speaking to Caiozzi, this writer remembers discovering how highly he thought of Donoso's power of penetration into his times and the assortment of creatures they produced.

As regards *La luna*, Donoso is on record that he had always thought of the story as rich and ripe for film-picking, "I once went to Valparaiso and said to myself that I must

do something with the hills there that struck me as so pretty. But what is implicit in the film is my fascination for the disintegration of things, for decadence. It contains the symbolism which is in nearly all my novels: the enclosed space, the apartment, the person who distorts reality, the invalid, the element that comes to upset the established order, the love of Lucrecia."

To depict Caiozzi's world on the screen meant that the director had to take a number of visual and aesthetic elements into account. Caiozzi: "It is a universe of atmosphere, of friction, of characters who are always on the brink of something. The objects shown are also participants: the curtains that seem to breathe, houses that creak, furniture with sensuous shapes. It's a world in which the environment is another character, a sensory world where you can smell decay – or the onion being minced by Gordo."

Don Arnaldo, the father, is always looking backward. He is a relic of the past, a museum piece, afraid of the present but even more of what the future holds for him. The antique look of the film goes hand-in-hand with the portrayal of the decrepit old man. Despite the feeling that the story takes place anytime during the period 1973 to 1990, the period of the dictatorship, it is a much older past that is revived in frame after frame – a past that is orthodox, mediocre, often mean, failing to rise above sloth and self-seeking. The music that Don Arnaldo listens to is from many years ago, and so are the furniture and the furnishings with which he has surrounded himself. The film's dramatic tension grows out of the collision between the old man's effort to keep out the winds of change blowing outside his window and his son's deeply-felt need to break out of the damp-smelling mould to which he has been condemned.

As the film grows older, the possibility also grows inside the viewer's head that, had the ancient mariner – Don Arnaldo is a retired naval commander – been younger or fitter, he would have given his recalcitrant son the beating of his life and seen to the end of his affair with Lucrecia; and gone back to the past when his word was law in the house. As it is, he is not above 'manhandling' Lucrecia at whom, in one especially charged passage, he is seen lashing out with all the impotent rage of a failed despot who desperately wants to preserve his position of power but cannot prevent its inexorable collapse.

La luna reflects richly yet cruelly another Donoso theme – the individual's need to escape a role imposed on him by society. The son, otherwise so deeply attached to his father, does not make any move to prevent the defeated old man, looking both tragic and pathetic in his naval officer's dress angrily scooped out of mothballs to make a grand departure from the scene of his humiliation, from walking into the cold snowy night. In the old man's disappearance is the young man's deliverance, his flight to freedom – real, imaginary, or an uncertain amalgam of the two. The viewer, meanwhile, sits still in his seat, numbed at the thought – what profit at what loss!

Caiozzi's place in Chile's 'Coup Cinema' is further assured by his documentary video called *Fernando is Back Home*, which attests to both his abiding loyalty to the memory of the *desaparacidos* (the disappeared) and his passion for using different cinematic genres to give expression to his roles as artist, citizen and human being. There are not too many instances of a filmmaker doing both fiction and documentary on a similar subject with equal success. Since the return of democracy to Chile in 1990, unidentified human remains buried without record during the dictatorship have been unearthed at sites across the country. Fernando de Olivares Mori, 27, at the time of his death, vanished one day for his expressed political beliefs and was hastily buried. Once the body of the former United Nations employee was disinterred, the procedure

for clearly establishing the identity of his remains took another four years. Fernando is Back Home opens with the victim's family as they face his remains and listen to a detailed explanation from doctors of the medical verifications that were performed. From their testimony, one learns of the spine-chilling facts of Fernando's end.

Those facts relating to the murder of just one of the thousands that the junta eliminated to make Chile "safe from Communism", should have been enough to indict Pinochet. But in late-1999 and early 2000, the then British Foreign Minister, Jack Straw, harboured other plans for the tyrant held under house arrest near Wentworth, west of London. Citing bogus medical evidence that Pinochet was in no state to stand the physical and mental strain of a prolonged trial in England, Spain, Belgium or Switzerland (countries whose nationals the dictator had killed in Chile), Straw made it possible for him to fly out of England. Instead of being punished for his crimes against humanity, Pinochet flew back to the safety of Santiago where, as a senator for life, he was immune to legal proceedings against him.

To return to Fernando, who came home to his people not on his feet but in a coffin, the forensic surgeon's report to the dead man's widow – broken bones, bullet holes in the skull – told its own tale of savagery. Fernando's mortal remains were finally buried in the presence of his family and friends, but the grief of the mother and the widow shows no sign of receding despite the passage of years. "Quarrels happen, like sorrows happen, in time all is forgotten" – even while acknowledging the pained wisdom in the poet's words, it somehow seems cruel to expect that Fernando's nearest relatives would close their eyes and forgive the killers. Life is a little more complicated than that.

Be that as it may, it should serve without emphasising that Caiozzi deserves the gratitude of film-lovers and history-seekers for documenting with a deep sense of responsibility, Fernando's return to the being and consciousness of his devastated people. With time, almost entire societies tend to forget the past; the past of bitter insults and inhuman brutalities. Caiozzi's film about the loss of a precious life in its prime is an attempt to revive collective memory and honour the dead.

As far as documentaries go, no one has chipped away so patiently, for so long and with such effective results, at the myth of Pinochet as Chile's "saviour against destabilizing forces", as Patricio Guzman. Trained in cinema in Franco's Spain, Guzman made five feature-length documentaries during Allende's short time in office, but it is principally for the monumental *La Battala de Chile* (The Battle of Chile) that he will be remembered.

This epic three-part documentary recounts the hope and struggle for a better future that rent the Chilean air during the Allende years – and their tragic demise. It has deservedly exercised enormous influence all over the world on filmmakers and film-viewers alike. Asked to indicate his favourite documentary by a reputed European film journal some years ago, Anand Patwardhan chose *The Battle of Chile*, which is as well the Bombay director's own vision of social justice and the process of participation by the popular classes in nation-building along new, daring lines, coincides with many of the signals sent out by this extraordinary celluloid journey into the soul of a potentially rich but actually impoverished nation struggling for change through peaceful, democratic methods. Patwardhan: "As a student in America in the radical 1970s, I saw many documentaries that began to push me towards filmmaking as a viable form of social action, but the film that remains etched in my mind is Patricio Guzman's The Battle of Chile."

Recalling those days when he himself

was having a trying time choosing between Gandhi and Marx, the two father-figures who have since long wrestled to possess the imagination and the conscience of many an educated Indian interested in social uplift, Patwardhan wrote: "Chile's President Salvador Allende was already an icon. I was grappling with the desire to convert my Marxist friends to accept the ethics and strategy of non-violence, while trying to convince my Gandhian friends that non-violence without class struggle could not bring justice. Here was a Marxist who came to power not through a bloody revolution but through elections. When a CIA-sponsored military coup killed Allende on 11 September 1973, and thousands of workers and citizens were massacred, it was a devastating blow to the cause of democracy and socialism. Guzman's epic documentary captured the glory and the tragedy of the Allende years."

Apart from the importance of the film's content, what clearly fascinates India's foremost documentarian who does not shy away from the role of determined dissenter, are its formal qualities and its engagement with an aesthetics that can be poetic even as stormy political events are recalled. "In the 1970s, Julio Garcia Espinosa hailed the arrival of 'Imperfect Cinema', its hand-held, black-and-white, grainy, fast-moving footage bearing the marks of the struggles it depicted. Guzman's aesthetic rises beyond 'imperfection' and self-conscious radicalism, its poetry stemming from an unerring faith in the importance of the ordinary as it intertwines with the extraordinary."

Democracy may have returned to Chile but it will be a long time before memories of that dark night, authored combinedly by the native oligarchy and the Pentagon, are forgotten. Memories of friends and relatives disappeared; of neighbours who chose to look the other way lest they got involved with the authorities; of strange lands of exile that threw up unexpected comrades; and of a divided society with hearts and sensibilities so badly riven that time may try but will never wholly heal.

One of the undying articles of human faith which, however, seems no more than a myth at times, has it that time takes care of all wounds. May be it does, may be it does not, who can tell for sure. But, how to explain things to those bereaved who can assuage their feelings only by weeping alone in the dark till they drop down from an exhaustion of tears. These are some of the many thoughts that pace up and down the corridors of one's mind as he or she encounters some of the exalted specimens of Chile's 'Coup Cinema'. If Pinochet's surviving salesmen of death are finally rounded up as a result of the court order pronounced in late May, 2008, and adequately punished, their victims, wherever they are – in unmarked graves, in proper cemeteries, or gone with the wind – will have reason to rest in peace at long last. But even after that, Guzman, for one, may be counted upon to continue to be haunted by obstinate memories of sunless days and nights without end. "For me, it is as if the coup d'etat took place yesterday." – Guzman

খোঁড়ার মাঠ থেকে গিরিশ পার্ক

সুবীর ভট্টাচার্য
সম্পাদক, *যারা যাযাবর*

৮৪ ফুট চওড়া রাস্তাটির নাম ছিল তখন মানিকতলা স্পার। ১৯৩০ সালের ২৩ জুলাই কলিকাতা পুরসভা এই পথের পাশের সিমলা পাড়ার জগৎ বিখ্যাত সন্তান বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের নামে রাস্তাটার নতুন নামকরণ করে বিবেকানন্দ রোড। এই বিবেকানন্দ রোড পশ্চিমে হ্যালিডে রোড (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ) ভেদ করে আরো পশ্চিমে আপার চিৎপুর রোড (অধুনা রবীন্দ্র সরণি)-এর দিকে এগোবার মুখে পেয়েছিল পাশাপাশি দুটো পুকুর—জোড়াপুকুর। জোড়াপুকুরের চারপাশে ছিল মাঠ। মাঠের একপাশে ছিল বাগান। পুরসভার নথিপত্রে এর পরিচিত ছিল 'জোড়াপুকুর স্কোয়ার' নামে। পাশের ছোট গলিটার জোড়াপুকুর স্কোয়ারের নামে নাম ছিল 'জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন'। কলকাতার কোন কোন অঞ্চলের পুকুর অস্তিত্ব হারিয়ে আজ যেমন শুধু রাস্তার নাম—মুরারিপুকুর রোড, ঝামাপুকুর লেন, শ্যামপুকুর স্ট্রিট-এর মধ্যে নিজেদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের জোড়াপুকুরের স্মৃতিও আজ ছোট্ট গলিটা তার নামের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে। তবে যে নামেই রাস্তার নামে স্কোয়ারের নাম থাকুক না কেন, জোড়াপুকুর এবং তাদের সংলগ্ন মাঠটার পরিচিতি স্থানীয় মানুষদের কাছে ছিল 'খোঁড়ার মাঠ' নামে। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ* গ্রন্থে লিখেছেন, "জোড়াপুকুর স্কোয়ারে বেড়াতে যেতেন আমাদের নিয়ে। খোঁড়ার মাঠ বলেই আমরা তখন জানতাম।"

কে ছিলেন এই খোঁড়া মানুষটি যাঁর নামে মাঠটার নাম হয়েছিল 'খোঁড়ার মাঠ'! অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন খোঁড়া মানুষকে খুঁজে পেলাম। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর অঞ্চলে 'খোঁড়া গাজী' নামে একজন মুসলমান সাধকের খোঁজ পাওয়া গেল। তাঁর পায়ে সমস্যা ছিল বলে তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। সেইজন্য মানুষের কাছে তিনি 'খোঁড়া গাজী' নামেই পরিচিত ছিলেন। সোনারপুর থানার কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুঁড়িগাছি গ্রামটি এখনো তাঁর স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে।

জোড়াপুকুর স্কোয়ারের নিকটস্থ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরও দুই পীরগাজীর কথা সকলেরই জানা। একজন সোনা গাজী। পুরো নাম গাজী সোনাউল্লা শাহ চুস্তি রহমতউল্লা আলে। ইরান থেকে তিনি প্রথমে উত্তর ভারতে আসেন। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে সুতানুটি অঞ্চলে। এখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্তের *কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি একজন দুর্দান্ত মানুষ ছিলেন। লাঠালাঠি, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামাই ছিল তাঁর উপজীবিকা। মারা যাবার পর তিনি গাজী হয়েছিলেন। "যতদিন বাঁচিয়া ছিলাম, ততদিন অনেক লোককে মারিয়াছি, অনেকের মালপত্র লুঠ করিয়াছি, অনেক ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ঔষধ দিয়া লোকের প্রাণ দান দিব, আর যে আমার সিন্নি দিবে, তার খুব ভাল করিব।"

সোনাগাজী সম্বন্ধে অন্য আরেকটি মত হল, তিনি ছিলেন ইরানের খানদানি বংশীয় একজন দরবেশ। ভারতে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের

উদ্দেশ্যে। তাঁর নামেই কলকাতার প্রধান Red Light Area-র নাম পরে মানুষের মুখে মুখে হয়ে যায়, 'সোনাগাছি'। এইখানে এক দরগার মধ্যে আজও তাঁর কবর রয়েছে। তবে দরগার সাবেক রূপটি আর নেই। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভস্মীভূত হবার পর দরগাটি দ্বিতীয় জন মানিকপীর মুসলিম সাধকের নামে নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের নাম হয় 'মানিকতলা'। কাছেই কারবালা ট্যাঙ্কের পাশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপর মানিকপীরের দরগা। ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, এখানকার মাজারের নিচে পীরসাহেবের দেহাবশেষ আছে।

পীরসাহেবের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সৈয়দ হোসেনউদ্দীন শাহ। তাঁর আস্তানা ছিল এই অঞ্চলের পঞ্চবটি কাননে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরা তাঁকে 'মানিকপীর' নামে সম্বোধন করত। লোক-বিশ্বাস, তিনি ছিলেন গো-পালক গো-দেবতা। দয়াল পীর সাহেব দয়া করলে তবেই গৃহস্থ গো-ধনে ধনী হতে পারবে। সেসময় এ অঞ্চল ছিল খেত-খামার, ডোবা-পুকুরে ভর্তি। মানুষের জীবনধারণের মূল অবলম্বন ছিল কৃষিকাজ পশুপালন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলেন মুসলিম। তাঁরা একান্ত বিশ্বাসে মানিকপীরকেই মান্য করতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এদেশে 'মানিকপীরের গান' নামে এক বিশেষ ভক্তি-প্রধান সঙ্গীতও জন্মলাভ করে।

সুতরাং সে সময়ে যে এ অঞ্চলে পীর-গাজীদের যাতায়াত ছিল সেটা বোঝা যায়। হতে পারে খোঁড়াগাজী কখনো এই অঞ্চলে এসে জোড়াপুকুরের ধারে আস্তানা গেড়েছিলেন। এখানে অবস্থানকালীন তাঁর পরিসুদ্ধ জীবনযাত্রা বহু মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর উদার সুফী-ভাবাদর্শে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়ে যান। আর তখনই 'জোড়াপুকুর স্কোয়ার' মানুষের মুখে মুখে 'খোঁড়া গাজীর মাঠ' পরে 'খোঁড়ার মাঠ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২৫ সালের ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুরসভা নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের নামে খোঁড়ার মাঠ ওরফে জোড়াপুকুর স্কোয়ার-এর নতুন নামকরণ করে গিরিশ পার্ক। পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে গিরিশচন্দ্রের একটা শ্বেতপাথরের উপবিষ্ট মূর্তি আছে। মূর্তিশিল্পী বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ ভাস্কর মি. ওয়াগ। ১৯২৯ সালের ৪ জানুয়ারি কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিমূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন।

তবে প্রাক্‌স্বাধীনতা কালে উত্তর-মধ্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, গ্রিয়ার পার্ক (বর্তমানে সাধনা সরকার উদ্যান), তারাসুন্দরী পার্ক, বিডন স্কোয়ার ইত্যাদির যে ভূমিকা দেখা যায় গণ আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে, গিরিশপার্কের ভূমিকা সেখানে খুবই অনুজ্জ্বল।

এই খোঁড়ার মাঠের পাশে ছিল 'চাষাধোবা পাড়া' নামে পল্লীটি। ১৯০৫ সালের ২ অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তাল স্বাদেশিকতায় এই চাষাধোবা পাড়াতেই স্বদেশি বিস্কুট তৈরি কারখানার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য়।

সেইসময় 'চাষাধোবা পাড়া স্ট্রিট' নামে একটি রাস্তাও ছিল এখানে। ১৯৪৩ সালে রাস্তাটির নামবদলের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় পুরসভার অধিবেশনে। *সি.এম. গেজেট*-এ খবরটা প্রকাশিত হয় ৭ আগস্ট ১৯৪৩। বর্তমানে রাস্তাটার নাম গিরিশ পার্ক (নর্থ)। বিবেকানন্দ রোড তৈরি হওয়ার সময় চাষাধোবা পাড়াটির বিলুপ্তি ঘটে।

Two Mss. on Astronomy and Mathematics of the Asiatic Society: Their Importance and Critical Appreciation

Jagatpati Sarkar
Life Member, The Asiatic Society

India possesses a very rich and enormous cultural heritage of valuable Manuscripts since the anicent period. India probably has the largest number of manuscripts of different subjects and scripts of varied languages in the world. Manuscripts collections are scattered in several places all over India and preserved in various types of academic and research institutions, temples, maths, maktabs and individual collections. Naturally, The Asiatic Society has preserved a lot of Mss. since its inception. The Mss. on Astronomy and Mathematics collection along with their subjects in The Asiatic Society are also estimated as heritage wealth of India till today. The Ms. of Siddhāntasundara of early 16th century A.D. of Jnanaraja and the Ms. of Yantracintāmaṇiṭīkā of 19th century A.D. are important in that point of view. The Siddhāntasundara is an elementary astronomical treatise written in verse concerning geography based on the work of Sakalya Muni. The knowledge concerning the nature of the motion of the planets and stars are also related here. The Yantracintāmaṇiṭīkā of Rama Daivajna is a text of quadrant instrument. The instrument helps the observations which can give us knowledge of the longitudes of the sun and the moon, and also the longitudes and latitudes of the planets. J. J. Middleton once did a very valuable research work on astronomy mentioning the name of Yantracintāmaṇi which was published in the *JASB*, Vol.8, 1939.

The Ms. of Siddhāntasundara is very important from the study of astronomical and mathematical research in ancient India. The name of the author of this Ms. is Jnanaraja. He was born in a learned family of Parthapur. According to Aufrecht Parthapur, a village situated on the northern bank of river Godavari, about two miles away from the confluence of the Godavari and Vidarbha, there lived a Brahmin astronomer named Naganatha who was father of Jnanaraja. The Siddhāntasundara is written in verse. Cintamani, the son of Jnanaraja had composed a commentary on this treatise as Grahagaṇita Cintāmaṇi or Vāsanā Bhāsya. This is to be noted that after Siddhānta Śiromaṇi, Siddhāntasundara was one of the most important and major astronomical works in our country. Right at the beginning of the Siddhāntasundara, Jnanaraja explicitly gives his main source, as well as other treatises considered authoritative by him. This Ms. was written in phrased way using double exposure, i.e. one level of meaning provides as narrative, and the other provides the technical information which can necessarily solve the given problem. The Siddhāntasundara has two main parts. They are Golādhyāya and Gaṇitādhyāya respectively. The Golādhyāya

contains six chapters. They are Bhuvana Koṣa–79 verses, Chedakyādhikāra-21 verses, Maṇḍala Varṇanam-16 verses, Jantramila-18 verses, Rituranmana-34 verses. The Gaṇitādhyāya contains 11 chapters, i.e. Madhyamādhikāra-90 verses, Spasaṭādhikāra-46 verses, Tripraśnādhikāra-45 verses, Parvasambhudhyādhikāra-6 verses, Candragrahaṇādhikāra-45 verses, Suryagrahaṇādhikāra-15 verses, Grahadayāstādhikāra-18 verses, Nakṣatrachāyādhikāra-23 verses, Sṛngunnatyādihikāra-18 verses, Grahayatyādhikāra-8 verses, Pātādhikāra-14 verses. The Asiatic Society has two Mss. on Siddhāntasundara vide No.–G.7922 and G.8210 respectively. Among them the G.7922 is incomplete. The India Office Library, London, Rajasthan, Banaras, Allahabad, Alwar, Mithila and other places also possessed this Ms. in their repository. The new concept of this text is to explain the astronomical events which are different from Bhaskara. The yantramālā chapter describes the instrument. The sequence of the chapters is very important to build up knowledge on subject concerned. Actually Indian Astronomy has been divided into three categories (1) Mathematical Astronomy (Gaṇita Jyotiṣa), (2) Applied Astronomy (Phalita Jyotiṣa), and another is (3) Mixed Astronomy (Miśra Jyotiṣa). Mathematical Astronomy is purely based on Astronomical thought. Astronomy, the word has been derived from the Greek root 'Astron' meaning star and 'Nemo' means arrange, i.e. Astronomy is a science which states the geometrical position of the stars in the sky at a particular moment. Therefore, Mathematical Astronomy mainly discussed on the calculations on the positions of stars, planets, transmit and reaction of solar system etc.

But Applied Astronomy or better called Astrology is mainly based on the effect of stars, planets and the solar lunar reactions on human mind, body and socio-cultural life. For this reason Hora-Jyotiṣa is termed as Astrology. And Mixed Astronomy is where Mathematical Astronomy and Applied Astronomy both have been provided for calculation. The Siddhāntasundara belongs to the first category of Mathematical Astronomy. And this statement has been rightly justified by the author himself in his natural manner. He tells 'Jyotiśāstram gaṇita Janana Prakriyā saṃhitābhistri skhandam tatakhacharajanitam tayamtramukha niruktam,' means Jyotiśāstra i.e. astronomy is always based on gaṇita prakriyā i.e. mathematical method and this is saṃhitā of three combinations of sikṣa, kalpa, and chanda. Actually this has been assumed that, sikṣā is the eyes, kalpa is the hands, and chanda is the legs, and Nirukta is the mouth of Jyotiṣa. This may be noted that all the above four categories are of mathematical origin in nature. Anyway, the Ms. of Siddhāntasundara is a unique astronomical treatise where Jnanaraja as its author followed the mathematical method in his whole composition. This Ms. has been published by Nations Mission for Mss., New Delhi, 2022 duly edited by Dr. Jagatpati Sarkar and Dr. Somnath Chatterjee.

Another, the Ms. of Yantracintāmaṇiṭīkā is also a very important and authentic composition of mathematical text of astronomy of The Asiatic Society Collection. Originally the Ms. of Cintāmaṇi was composed by Chakradhara in the year 1729. He was a son of Vāmana. He was a great astronomer of the period. This Ms. is a text of quadrant instrument. J. J. Middleton of the Hindu College, Calcutta once wrote an article in the *JASB*, 1839, Vol. VIII, Pt. II B. entitled—'Description of an astronomical instrument presented by Raja Ram Singh of Khota to the Government of India'. In this article he stated that the instrument which

was given to the Government of India was a very good specimen of its kind. The body of the instrument consists of a square plate of pure and massive silver, in addition to which, on one side, plummet or index rod, which revolves freely in the vertical upon an axis fixed at one of the angles of the plate, and at the termination of a tube of about one- sixth of an inch in diameter, which runs the whole length of one side of the instrument. On the other an index, consisting of four hands, at right angles to each other, and of rearly the radius of the plate, is screwed on to the centre of the plate, around which it revolves at pleasure. This instrument was styled on the principles of Yantracintāmaṇi under the direction of Raja Ram Singh of Khota, who was an encourager of learned men. This may be appreciated that this instrument was of very modern construction fabricated or made by the then astronomer of some thousand years ago. This and the great rarity of astronomical instruments in India, at least in this part of it, contribute to its considerable importance. Anyway, The Asiatic Society possesses five Mss. in its archives with text and commentary. The Mss. of Yantracintāmaṇi on astronomy are already available in many places in India and abroad. Such as Alwar, Jaipur, Lucknow, Bombay, Mysore, Mithila, Baroda and America. The commentary of different commentators are also available in different parts of our country. The Asiatic Society has two commentaries i.e. Yantracintāmaṇi Dīpikā and Yantracintāmaṇi Candrikā, both are composed by Rama Daivajna, son of Madhusudana. The commentary of Yantra Dīpikā is available from Bikaner, Bombay, Lucknow and other places. But this is important to mention that the information about Yantra Candrikā of Kashinath Bhatta, son of Jayaram Bhatta is only available in Alwar. So this may be assumed that this commentary of Rama Daivajna of The Asiatic Society is very rare in this context and this is complete. The commentaries of Dinakara, Ramasankara, Ramasukla, Harisamkara, Sriharsa, Ratnakara, Bhavani sankara are also available in many places of our country.

Lastly, I come to the conclusion that the Mss. on Gaṇita composing Astronomy are very notable one in astronomical research and study in ancient India. Starting from the Vedāṅga Jyotiṣa, the Āryabhaṭiya, called the Āryabhaṭiya Siddhānta, and the other Siddhāntas or the Hindu scientific works in Astronomy and various looks on astronomical role to develop our traditional knowledge in science and technology of ancient India. The Asiatic Society of Kolkata from its very inception helped the nation by supplying the very notable information, observations and materials a lot as a mine which has no doubt showed her greatness and gravity for the national advancement in Science and scientific research in India.

Vijoy S. Sahay delivering the Lecture.

Panchanan Mitra Memorial Lecture 2022

The Asiatic Society Kolkata organised Dr. Panchanan Mitra Memorial lecture 2022 on 4 October 2023 at 03:00 p.m. at Humayun Kabir Hall of The Asiatic Society, Kolkata. Professor Vijoy S. Sahay, Professor Emeritus, Former Head, Department of Anthropology, University of Allahabad delivered the lecture on the topic i.e. 'Indian Anthropology against the Backdrop of the World Anthropology'. Professor Swapan Kumar Pramanick, President of The Asiatic Society presided over the programme. The programme ended with the Vote of Thanks by Dr. Asok Kanti Sanyal, Biological Science Secretary (Acting Treasurer) of the Society.

Pashto Manuscripts in the Collection of The Asiatic Society

S.S.F.I. Al-Quaderi
Cataloguer, (Museum) The Asiatic Society

The Museum of The Asiatic Society, Kolkata offers a rich collection of various Asian languages. Amongst these, there is a small collection of manuscripts in Pashto language. The collection came from the Fort William College to The Asiatic Society of Bengal after the closure of the said college. The collection comprises: Prose, Poetry, Grammar, History as well as religious contents etc.

Before furnishing a list, here is a brief history of the Pashto Language and Literature.

Pashto is an Eastern Iranian Language. The history and origin of the Pashto language can be traced back to the Indo-European language family. Its linguistic roots can be found in ancient languages like Avestan and old Persian. As centuries passed, the language was enriched by the influence of various cultural interactions and external linguistics, including Persian, Arabic and Turkish. Pashto has two main dialects, western dialect and the eastern dialect. It became the national language of Afghānistān in 1936. The total number of Pashto-speakers is estimated to be at least 40-60 million. It is spoken by the Pashtūns mainly living in Afghānistān and Pakistān. It is also the provincial language in Khyber Pakhtūnkhwa, Pākistān.

Pashto is spoken in India, Tajikistān and northeastern Irān (primarily in South Khorasān Province to the east of Qaen, near the Afghān border). In India there are small numbers of Pashto speakers, such as the Sheen Khalaī in Rajasthān, and the Paṭhān community in the city of Kolkata. The Pashtūn diaspora around the world speaks Pashto, especially the sizable communities in the United Arab Emirates and Saudi Arabia.

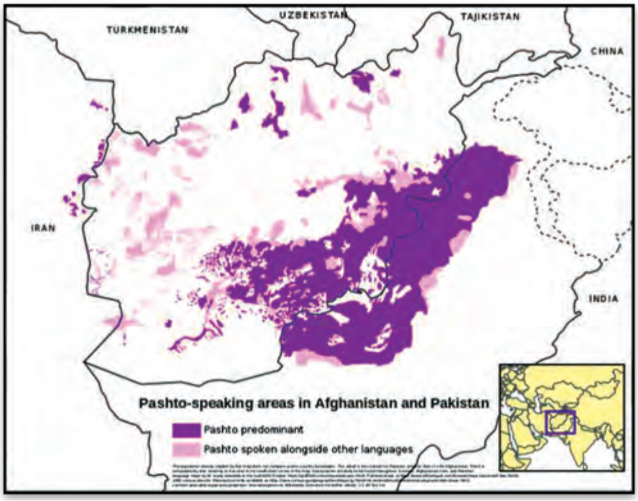

Pashto has a rich tradition of oral and written literature, including poetry, proverbs and folk stories. From the 16th century, Pashto poetry became very popular among the Pashtūns. Music and arts play a vital role in the Pashtūn culture. "Rubāb", the Traditional musical instrument is a

part of social gathering and celebrations amongst the Pashtūns. Celebrated Pashto poets contributed greatly to the growth and development of the language. Bāyazīd Khān Anṣārī Pīr Rōshān (1525–1585 A.D.) contributed greatly by introducing 13 new letters to the Pashto alphabet and was an exponent, spreading his message to the Pashtūn masses. Khushḥāl Khān Khaṭak (1613–1689 A.D.), the national poet of Afghānistān who flourished during the reign of the Mughal Emperor Aurangzeb, used spontaneous and forceful poetry of great charm to rally for Pashtūn unity. Some other notable Pashto poets are Raḥmān bābā (1650–1715 A.D.), Nāzo Tokhī (1651-1717 A.D.) and Aḥmad Shāh Durrānī (1722–1772 A.D.), founder of the modern state of Afghānistān or the Durrānī Empire. From the time of Aḥmad Shāh Durrānī, Pashto has been the language of the court. The first Pashto teaching text was written during the period of Aḥmad Shāh Durrānī by Pīr Muḥammad Kakar with the title of 'Ma'rifat al-Afghānī' (The Knowledge of Afghānī).

Some notable Pashto works are mentioned below:

- 'Paṭah Khazāna' (The hidden treasures)
  Considered a pioneer of Pashto Literature. The work is a collection of Poems, reflecting themes of courage, honour and resistance.

- 'Zmaka Spogmaī' (The evening star)
  A novel written by Qalandar Momand. This work is one of the first novels in Pashto literature.

- 'Lar-o-Bar' (Downwards and upwards)
  Written by Ghanī Khān, son of Khān 'Abdu'l Ghaffār Khān (known as Frontier Gandhi, was an exponent for Hindu–Muslim unity in the Indian subcontinent), this collection of poetry and prose delves into philosophical and social themes, advocating for non-violence, education and social reform.

A short list of Pashto manuscripts in the possession of The Asiatic Society, Kolkata are as follows:

1) PSC 1732

Lughāt-i-Pashto لغات پشتو

A fragmentary list of Pashto verbs, with their Hindustānī equivalents.
Transcribed in the 12th c. A.H.
Beginning: راغي (اتا)، راغلي دى (اتاهي) الخ

2) PSC 1733

Yūsuf-u-Zulaykhā يوسف و زليخا

A Mathnawī poem, in Pashto, on the very popular story of Joseph. It is apparently a translation of Jāmī's Yūsuf-u-Zulaykhā. Transcribed by Ākhūn-zādā Mullā walī, in Kashmīr, in the year 1232 A.H.
Beginning: عنايت رب بماكر الخ

Yūsuf-u-Zulaykhā

3) USC 149
Title: Diwān-i-Raḥmān
دیوان رحمان
Author: 'Abdu'r Raḥmān Muḥammad
A collection of poems in Pashto.
Beginning: کوره هسے کردکار دی رب ثما الخ

4) USC 151
Title: Kulliyāt-i-Khushḥāl
کلیاتِ خوشحال
Author: Khushḥāl Khān Khaṭak
A collection of poems in Pashto.
Beginning: صورت کرچہ شہ صورت یدال.....کا الخ

5) USC 145
Title: Tarjuma-i-Gulistān
تر جمتہ گلستان
Translated by Amīr Muḥammad b. Mīr Muḥammad Anṣārī
Beginning: ہَمَہْ وَارَہْ ثَنَا و صِفَتْ اَوْ کُلْ احسْان و مِنّتْ الخ

6) USC 146
Title: Shajaratu'l Wasāt-i-Afghānī
شجرة الوساة افغانی
It deals with the History of Afghān.
Beginning: باسمك القدوس سبحان الله و بحمدهِ الخ

7) USC 148
Title: Diwān-i-Mīrzā — دیوان میرزا
Author: Mīrzā
A collection of poems in Pashto.
Beginning: ....کرم خو صفت الخ

8) USC 147
Title: Lughāt-i-Zabān-i-Afghānī — لغات زبان افغاني
It contains Dictionary in Pashto.
Beginning: واكر لفظ دي را درميان صيغه هاي متكلم الخ

In conclusion, The Asiatic Society, Kolkata plays a very important role in the preservation of a vast collection of various remarkable manuscripts that provide an invaluable glimpse into the very cultural ethos of Asia, its heritage and its people.

References:

1. *Constitution of Afghānistān* – 'Chapter 1 The State, Article 16 (Languages) and Article 20 (Anthem).'
2. *The Hidden Treasure: A Biography of Pashtūn Poets* by Ḥotak Muḥammad 'Abdu'l Ḥaī Ḥabībī (1997).
3. *Pashto–English Dictionary* by Zeeya A. Pashtoon (2009).
4. *Concise Descriptive Catalogue of Persian Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society of Bengal* by W. Ivanow 1924 (Calcutta).

One-Day Collaborative Seminar on 'Insights into Social Inclusion: Lived experiences of individuals with Autism and their families'

Exhibitions of drawings by individuals with Autism at the programme.

The Asiatic Society in collaboration with Autism Society West Bengal (ASWB) has organised a One-Day Seminar on 'Insights into Social Inclusion: Lived experiences of individuals with Autism and their families' on 25 August 2023 at 11:30 A.M. at the Vidyasagar Hall of the Asiatic Society Kolkata.

The Inaugural Session of the programme began with the offering of garland to the bust of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. The welcome and keynote addresses were delivered by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of the Society and Ms. Indrani Basu, Founder Director of Autism Society West Bengal (ASWB) respectively. The Presidential Address was delivered by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Society. The session ended with Vote of Thanks given by Dr. Asok Kanti Sanyal, Treasurer (Acting) of the Society followed by folk-dance exhibition by Ms. Barsha Deb, trainee at the Aarohan vocational unit of Autism Society West Bengal.

During Technical Session, eminent speakers viz. Dr. Mitu De (Honorable Secretary of ASWB & Associate Professor, Dept. of Botany, Gurudas College), Professor Mallika Banerjee (Former Professor of Department of Pure Psychology, Calcutta University), Dr. Shankar Kumar Nath (Oncologist and Medical Science Secretary of the Society) spoke some words. Six self-advocates viz. Shri Amitrajit Biswas, Shri Parthiv Ghosh, Shri Amitava Basu, Shri Rajarshi Rit, Shri Aratrik Bublu Dey and Shri Aditya Ganguly shared their respective stories dedicated to the theme of the said programme.

The programme concluded with a valedictory session followed by prize distribution among the participants.

Half-Day Seminar on 'Harappan Culture in Retrospect: Revisiting an Archaeological Discovery'

L to R : Dr. Satyabrata Chakrabarti, Professor Swapan Kumar Pramanick, Professor Arun Bandopadhyay and Dr. Asok Kanti Sanyal

The Asiatic Society Kolkata has organised a Half-Day Seminar on 'Harappan Culture in Retrospect: Revisiting an Archaeological Discovery' on 1 September 2023 at 02:00 P.M. at the Vidyasagar Hall of the Asiatic Society Kolkata.

The Inaugural programme of the Seminar began with the delivery of welcome and introductory addresses by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary and Professor Arun Bandopadhyay, Historical and Archaeological Secretary of the Society respectively. The Presidential Address was delivered by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Society who also chaired the aforesaid programme. The said session ended with a vote of thanks given by Dr. Asok Kanti Sanyal, Treasurer (Acting) of the Society.

The programme continued with an Academic Session chaired by Professor Gautam Sengupta (Former Director, The Archaeological Survey of India). Four (04) eminent speakers viz. Dr. Phanikanta Mishra (Former Regional Director, Archeological Survey of India), Dr. Kaushik Gangopadhyay (Assistant Professor of Archaeology, Calcutta University), Smt. Bahata Angshumali Mukherjee (Independent Researcher, Bengaluru) and Smt. Varada Khaladkar of Calcutta University spoke on their respective topics dedicated to the theme of the said Seminar. The session continued with a brief discussion among the speakers and other dignitaries followed by the Chairperson's address.

Commemorating the Birth Centenary of Three Eminent Teachers

L to R : Dr. Satyabrata Chakrabarti, Professor Swapan Kumar Pramanick, Professor Syamal Chakrabarti and Dr. Asok Kanti Sanyal

The Asiatic Society Kolkata has organised a One-Day Seminar on 'Commemorating the Birth Centenary of three eminent teachers' held on 14 September 2023 for paying the centenary tribute to three eminent teachers viz. Professor Amal Kumar Raychaudhuri, Professor Shyamal Sengupta and Professor Samarendranath Ghosal at the Vidyasagar Hall of The Asiatic Society. The programme began with the Inaugural Session at 11 a.m. subsequently followed by three consecutive academic sessions at 12:00 noon, 2:00 p.m. & 3:30 p.m. respectively. The Inaugural Session commenced with the delivery of Welcome Address by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of the Society whereas the Introductory Address was delivered by Professor Syamal Chakrabarti, Publication Secretary of the Society who was also the Coordinator for the said programme. Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Society delivered his Presidential Address followed by Vote of Thanks by Dr. Asok Kanti Sanyal, Treasurer (Acting) of the Society.

The First Academic Session of the programme began with the lecture given by Professor Amitava Raychaudhuri, Former Director, Harish Chandra Research Institute, Allahabad who spoke on the topic 'Life and Works of Prof. A.K. Raychaudhuri' while it ended with the lecture by Professor Soumitra Sengupta, Amal Kumar Raychaudhuri Chair Professor in the School of Physical Sciences, Indian Association for the Cultivation of Science, Jadavpur speaking on the topic 'Raychaudhuri's Equation and Beyond' thus paying their tribute to Professor Amal Kumar Raychaudhuri.

During Academic Session II, Professor Dipak Ghosh, Former Professor of Physics, Jadavpur University spoke on the topic 'Life and Works of Professor S.N. Ghosal' whereas Dr. Amit Roy, Former Director, Inter-University Accelerator Centre, New Delhi spoke on the topic 'Nuclear Research in India' thus paying their tribute to Professor Samarendranath Ghosal.

The final Academic Session began with Professor A.N. Basu, Former Vice-Chancellor, Jadavpur University giving his lecture on the topic 'Life and Works of Professor S. Sengupta' whereas Professor Biswarup Mukhopadhyay, IISER, Kolkata spoke on the topic 'Professor S. Sengupta : My teacher, my memories' thus paying their tribute to Professor Shyamal Sengupta.

Special Lecture on 'The Western Roots of Indian Script and the Indus Calendar' by Dr. Bradley R. Hertel

Dr. Bradley R. Hertel delivering the Lecture.

On 9 October 2023, The Asiatic Society organised an enlightening lecture on 'The Western Roots of Indian Script and the Indus Calendar' by Dr. Bradley R. Hertel, who was the Former Professor of Virginia University of United States of America.

The programme was inaugurated by Dr. Satyabrata Chakrabarti, the General Secretary of The Asiatic Society. The lecture drew parallels between the pictogram of Newgrange entrance stone in Ireland and that of Indus script.

The lecture was followed by very lively discussions among the scholars and Dr. Hertel where his hypothesis was questioned by several scholars. The programme came to an end with Professor Swapan Kumar Pramanick, President of The Asiatic Society delivering concluding remarks and Dr. Asok Kanti Sanyal conveying the Vote of Thanks.

Observation of 50th Death Anniversary of Nobel Laureate and Poet Pablo Neruda in collaboration with Rekha Chitram, Salt Lake

L to R : Mr. Arun Kumar Chakraborty, Professor Subhoranjan Dasgupta, Dr. Satyabrata Chakrabarti, Professor Swapan Kumar Pramanick, Shri Samik Bandyopadhyay and Shri Vidyarthy Chatterjee

The Asiatic Society in collaboration with Rekha Chitram, Salt Lake organised a programme for observing the 50th Death Anniversary of Nobel Laureate and Poet Pablo Neruda on 10 October, 2023 at 04:00 p.m. at the Rajendralala Mitra Bhavan, Salt Lake Campus of the Asiatic Society, Kolkata. The welcome and introductory addresses were delivered by Dr. Satyabrata Chakrabarti, honorable General Secretary of the Society and Mr. Arun Kumar Chakraborty, Principal of Rekha Chitram respectively. Writer and critic Shri Samik Bandyopadhyay and veteran writer Shri Vidyarthy Chatterjee shared their respective thoughts followed by a few poems of Pablo Neruda read out by Professor Subhoranjan Dasgupta. A documentary film named 'The Images of Dictatorship' was shown to the invitees of the said programme. The Presidential Address was delivered by Professor Swapan Kumar Pramanick, President of The Asiatic Society. The programme ended with the Vote of Thanks by Professor Asok Kanti Sanyal, Biological Science Secretary (Acting Treasurer) of the Society.

Post-Congress of 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress 2023

L to R : Dr. Satyabrata Chakrabarti, Professor Basudeb Barman, Professor Soumendra Mohan Patnaik, Professor Junji Koizumi, Professor Subhadra Channa, Professor Ajit K. Danda and Professor Sujit Kumar Das

The Asiatic Society Kolkata has organised Post-Congress of 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress on 'The Roots of Indian Anthropology: Transition from the Colonial Period to the Present' from 27 to 28 October, 2023 at the Vidyasagar Hall of the Asiatic Society Kolkata.

The Inaugural Session of the first day of the programme i.e. 27 October 2023, began with the lighting of lamp and placing of wreath on the bust of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar followed by invocation by the staff members of the Society and felicitation of the dignitaries by the President and other officials of the Society. The welcome and introductory addresses were delivered by Dr. Satyabrata Chakrabarti, honorable General Secretary of the Society and Professor Subhadra Channa, Professor of Anthropology, Delhi University and Vice-President of IUAES respectively. Professor Soumendra Mohan Patnaik, Professor of Anthropology, Delhi University and Chair of the Congress at Delhi for the 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress-2023 gave a brief address relating to the 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress – 2023. The Inaugural and Keynote Addresses were delivered by Professor Junji Koizumi, President of IUAES and Professor Ajit K. Danda, Former Director of Anthropological Survey of India respectively. The Presidential Address was delivered by Professor Basudeb Barman, Vice-President of the Society whereas Professor Sujit Kumar Das, Treasurer of the Society ended the said session with a Vote of Thanks. Special Lecture on 'Post-Colonialism and Brazilian Anthropology' was delivered by Professor Felipe Fernandes, Chair of Council of Commission, IUAES. The first day of the programme ended with the Round Table Session I where brief discussions took place among the dignitaries.

In the second day of the programme i.e. 28th October 2023, Session II was chaired by Professor Rajatkanti Das (Former Professor of Anthropology, Vidyasagar University) followed by Session III chaired by Profesor Ranjana Ray, Former Professor of Anthropology and Professor Emeritus, University of Calcutta. Professor Soumendra Mohan Patnaik chaired the Valedictory Session during which the Valedictory Address was delivered by Professor Kalyan K. Chakravarty (IAS (Retired) & Former Director of Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal). Professor Sukanta Chaudhuri (Editor, *Journal of the Ethnographic and Folk Culture Society*, Lucknow) was the Guest-in-Chief for the said Valedictory Session as it ended with a Vote of Thanks given by Dr. Sumita Chaudhuri who spoke on behalf of IUAES. The programme concluded with the National Anthem.

Report of the Two-Day Seminar on North-East India

The Asiatic Society, Kolkata in collaboration with Centre for Naga Tribal Language Studies (CNTLS), Nagaland University, Kohima organised a Two-Day Seminar on 'Emerging Issues of Language Endangerment In North-East India' on 2nd and 3rd November, 2023.

The Inaugural session was chaired by Professor Jano Sekhose, Dean, School of Humanities & Education, and the Head of Department, CNTLS, Nagaland University, Kohima. Welcome Address from Nagaland University was delivered by the Pro-Vice Chancellor, NU, Professor Glenn T. Thong. The Note of welcome from Dr. Satyabrata Chakrabarti, the General Secretary of The Asiatic Society, Kolkata was presented by Professor Shyam Sundar Bhattacharya. The Keynote Address was delivered by Dr. Satarupa Dattamajumdar, the convenor of the seminar. Dr. Samudra Gupta Kashyap, the Chancellor, NU delivered the Inaugural Speech. The participants were enthralled with a folksong, "Oh hi-yo hi" by the CNTLS, NU students. The Inaugural Session ended with the Vote of Thanks by Dr. Laishram Bijenkumar Singh. The First Academic Session was chaired by Professor Duovituo Kuolie. Professor Chungkham Yashawanta Singh presented his paper on the 'Challenges to the Endangered Languages of North East'. Professor Madhumita Barbora presented her paper 'Linguistic Diversity of Northeast India: Present Scenario'. Dr. Bishakha Das presented her paper 'Maintenance, Marginalisation and Shift of Language in Arunachal Pradesh'. Professor Pangersenla Walling presented her paper entitled 'Language Attitudes of Naga Youth Towards Mother Tongue'. The Second Academic session was chaired by Professor Chungkham Yashawanta Singh. Professor Duovituo Kuolie presented his paper 'Emerging Issues of Language Endangerment in Nagaland'. Dr. Mimi Kevichüsa Ezung & Kethokhrienuo Belho presented their paper 'Preservation and Promotion of the 'Naga' languages: A review on the Progress and Challenges faced by the State Government and the stake holders in Preserving, Promoting and Revitalising the State recognised languages of Nagaland'. 'Linguistic Status of Uipo (Khoibu) and Chang' was presented by Dr. Laishram Bijenkumar Singh. The Third Academic Session was chaired by Dr. Ramkumar Mukhopadhyay and presented his paper, 'From the Margin to the Mainstream: Resurrection of three North-Eastern Languages'. The paper entitled 'The Language of Narration: Exploratory Study of the Naga Oral Tradition(s),' was presented by Dr. Yanbeni Yanthan. Dr. Imlienla Imchen presented her paper 'Diminishing Cultural Knowledge and its Impact on Language'. The Fourth Academic Session was chaired by Professor Madhumita Barbora. Professor Shyam Sundar Bhattacharya presented his paper 'A Skeletal Demographic Context of Language Contact and the Emergence of North-East India as a Linguistic Area - Some general Observations'. 'Status of Linguistic Minority with special reference to some North-Eastern Languages in Multilingual India', was presented by Professor Mahidas Bhattacharya. Dr. Satarupa Dattamajumdar concentrated on the topic entitled 'Nature and Extent of Language Endangerment: Case Studies of Lepcha, Tiwa and Koch'. The Valedictory Session was addressed by Professor Chungkham Yashawanta Singh. The two-day Seminar ended with the Vote of Thanks by Dr. Yanbeni Yanthan. Ms. Mughalivi, the student from CNTLS, NU sang inspirational songs at the end of the seminar.

Acknowledgement

The discussions of the Seminar were reported by three rapporteurs from CNTLS, Nagaland University, Kohima--- (1) Ms Imchanola Tzudier (2) Ms Toshimenla Ao (3) Ms Mughalivi.

Satarupa Dattamajumdar
Member, Academic Committee, The Asiatic Society

অনুসন্ধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

প্রকাশক :পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০২২

মূল্য : ৪০০ টাকা

একটা স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নানা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত *অনুসন্ধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* এই পর্যায়ে নবতম সংযোজন। কিন্তু বইটা একটু ব্যতিক্রমী তাই এ বইটির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। ২২ জন গুণী প্রাবন্ধিকের ৩১টি প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই বইটি অন্য সব বইয়ের থেকে একটু স্বতন্ত্র। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা হলেও মূল বিষয়টি একসূত্রে গ্রথিত—তা হল 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'।

জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে এযাবৎকাল অপ্রকাশিত লাহোর থেকে ১৯৪৬-এ উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'Chattan' সাময়িক পত্রে মৌলানা আজাদের একটি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে মৌলানা বলছেন শুধু ধর্মের মিলের ভিত্তিতেই একটা দেশ গড়ে উঠতে পারে না এবং যদি গড়ে ওঠেও তার স্থায়ীত্ব কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান ধর্মের দিক থেকে এক হলেও অন্যান্য সবদিক থেকেই আলাদা। তাই দুই অংশের মধ্যে বিভাজন অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার ২৪ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুড নবীন ...... হিসাবে বাংলাদেশের উত্থান মৌলানার ভবিষ্যৎ বাণীর এক অমোঘ নিদর্শন।

অধ্যাপক রায়ের পর্যালোচনায় এটাও উঠে এসেছে চিনের সাথে পাকিস্তানের গোপন সমঝোতার চিত্র। ভারতের অগোচরে এই সমঝোতা তৈরি হচ্ছে এমন সময়ে যখন ভারত-চিন মধুচন্দ্রিমার রেশ তখনও বিদ্যমান। অধ্যাপক রায়ের লেখায় আলোচিত হয়েছে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই আমেরিকার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ও অভ্যন্তরীণ অভিমুখ ঠিক করে দেওয়া যা চরম আকার ধারণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং শেষ হয় ভারতের কাছে পাকিস্তানের লজ্জাজনক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সারা বিশ্বের কাছে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অনভিজ্ঞতা প্রকট করে দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেখানে দেখা যায় ভাষার প্রতি ভালোবাসায় বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ যার চরম পরিণতি ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ আছে এবং প্রতিটি প্রবন্ধই স্বকীয়ভাবে সমুজ্জ্বল। তিনজন প্রাবন্ধিকের লেখাতেই ভাষা আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস উঠে এসেছে যা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই শুধু বাংলার

জনমানসে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি একটা বিরাগের জন্ম দিয়েছিল। ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সুপরিকল্পিত আঘাতই যে বাংলাদেশ জন্মের আতুরঘর হিসাবে অনুঘটকের কাজ করেছিল তা আশীষ কুমার দাস, মো. মাহবুবুল হক ও পঙ্কজকুমার রায়ের প্রবন্ধে অতি স্বল্প কথায় বিবৃত হয়েছে। এর মধ্যে অধ্যাপক রায়ের লেখা একটু বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে কারণ তাঁর প্রবন্ধ একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। কম্যুনিষ্ট পার্টি কিভাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল তার একটা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তাঁর প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা খুব একটা প্রচারিত নয়। এ ইতিহাস তুলে ধরার জন্য অধ্যাপক রায়কে ধন্যবাদ। অধ্যাপক রায় তাঁর প্রবন্ধে তথ্য সূত্র নির্দেশ করতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ২৫তম খণ্ডের উল্লেখ করেছেন—কিন্তু কোন্ সংস্করণ তার উল্লেখ নেই। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি এর উল্লেখ থাকবে।

শিহরণ চক্রবর্তীর লেখায় ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রদের দুর্জয় শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর আলোচনায় বাংলাদেশ শোষণকারী ‘২২ পরিবারের’ কথা উঠে এসেছে যা এর আগে খুব একটা শোনা যায়নি। তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা থেকে জানা যায়. যে পাকিস্তান সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম কথাটি তুলে দিতে নেতৃত্বকে বাধ্য করেছিল। ছাত্র আন্দোলন যেমন আয়ুব সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ এক নতুন রাষ্ট্রের উত্থানে সহায়ক শক্তি হিসাবে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

মোঃ মাহবুবুল হক্ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংযুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলের এক বিশদ আলোচনা করেছেন এবং দলিলের এক বিস্তারিত তালিকাও তাঁর প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক হক্ তাঁর আলোচনায় লিখছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক প্রামাণ্য ইতিহাস লেখার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল প্রয়োজনীয় দলিলের অপ্রতুলতা। তাই বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের একক চেষ্টায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু দলিলের খোঁজ পাওয়া গেলেও এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন জায়গায় যে সকল দলিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তার যদি খোঁজ পাওয়া যায় তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আরও যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে লেখা হতে পারবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে অধ্যাপক সুনীল কান্তি দে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমটি থ্রীলার ধর্মী। গভীর রাতে ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধির সাথে শেখ মুজিবুরের সাক্ষাৎ, তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে শেখ মুজিবুরের চিঠি লেখা বা নেহেরুর সাথে গোপন যোগাযোগের চেষ্টায় ভারতের আগরতলায় আগমন ইত্যাদি চমকপ্রদ তথ্য অধ্যাপক দে-র লেখায় স্থান পেয়েছে। শেখ মুজিবুর নেহেরুকে লেখা তাঁর চিঠিতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম শুরু করার কথা জানালে দূরদর্শী নেহেরু তাঁকে আরও অপেক্ষা করতে বলেন কারণ তাঁর মতে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি শেখ মুজিবুরের পক্ষে অনুকূল ছিল না। নেহেরু যে কাজ করতে পারেননি সে কাজটি অবশ্য কিছু বছর বাদে তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর হাত দিয়ে সম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক দে-র পরের লেখার বিষয়বস্তু হল সামরিক বাহিনীর হাতে শেখ মুজিবুরের বিচার ঘোষণা হলে ভারতীয় লোকসভার সদস্যদের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া। শেখ মুজিবুর রহমান ২৫.৩.১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ভারতীয় লোকসভায় তা আলোচনা হয় এবং বহু সদস্য তাতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পাক সরকারের হাতে শেখ মুজিবুরের বন্দী হওয়ার পর যখন আগষ্ট (১৯৭১) মাসে জানা যায় যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুরের বিচার হবে তখন ভারতীয় লোকসভা ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। লোকসভায় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা হয় ৪.৮.১৯৭১এ। এরপরেও বিভিন্ন দিনে লোকসভায় শেখ মুজিবুরের গ্রেফতার

ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ নানা সদস্য অংশগ্রহণ করেন। দলমত নির্বিশেষে প্রতি সদস্যই বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপদে ভারতীয় জনগণ কতটা উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল সেই চিত্র অধ্যাপক খুবই সফল ভাবে তুলে ধরেছেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে যেটা অতি নগ্নভাবে প্রকটিত হয় তা হল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈমাত্রেয় সুলভ মনোভাব। অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সব বিষয়েই পশ্চিম পাকিস্তান তার সহযোগী অংশকে দাবিয়ে রাখার যে চেষ্টা করেছিল তা অধ্যাপিকা শামীমা হায়দার সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা এবং ১৯৬৫-এর যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সুরক্ষার প্রতি চরম ঔদাসিন্য মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিখ্যাত ‘ছয়দফা’ দাবি উত্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিল। লাহোরে প্রকাশিত এই ছয়দফা দাবির বিস্তৃত আলোচনা করে অধ্যাপক শামীমা হায়দার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই ছয়দফা কর্মসূচিই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মূল খণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর এই সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়।

অধ্যাপিকা শামীমা হায়দারের দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হলো শেখ মুজিবুরের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন, নবীন বস্তুকে ভারতের স্বীকৃতি, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠন ইত্যাদি। তাঁর লেখায়. স্বল্প পরিসরের মধ্যেও একদিকে যেমন পাক-বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ ফুটে উঠেছে আর দিকে দিকে তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লিখিত হয়েছে।

এস. এম. সারওয়ার মোর্শেদের লেখায় আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান। তাঁর আলোচনার ‘ক্যানভাস’টি বড় হলেও খুবই স্বল্প কথায় বিভিন্ন দলের মতাদর্শের আলোচনার সাথে সাথে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের নীতি তিনি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। জনসঙ্ঘ বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে কিন্তু সোচ্চার সমর্থন জানায়। স্বতন্ত্রদল কিন্তু প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে ছিল। স্বতন্ত্রদল মনে করত বাংলাদেশের স্বীকৃতিতে পাকিস্তানের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সঙ্গতি ছিন্ন হতে পারে যা তাদের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। এই সকল তথ্যগুলি কিছুটা অজ্ঞাত ও অনালোচিত। জনাব মোর্শেদকে এই তথ্যগুলি প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ।

অধ্যাপক গোলাম কিপ্রিয়া ভুইয়ার লেখায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার এক অজানা ইতিহাস জানা যায়। ২৬.৩.১৯৭১-এ শেখ মুজিবুর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ২৭.৩.১৯৭১-এ চট্টগ্রামে কর্মরত মেজর জিয়াউর রহমান পুনরায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসাবে দাবি করেন। তাঁর এই বিভ্রান্তিকর ঘোষণায় বাংলাদেশের একতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে ২৮.৩.১৯৭১-এ মেজর জিয়াকে বলতে হয় যে তিনি এই ঘোষণা করেছেন শেখ মুজিবুরের পক্ষ থেকে। তাঁর এই পরিবর্তিত বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ‘ঘোষক’কে এই বিতর্কের অবসান হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রারম্ভে এই ছোট্ট ঘটনাটি বেশ আকর্ষণীয় এবং তাঁর জন্য অধ্যাপক ভুঁইয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আলোচনা রয়েছে সবিরউদ্দিন আহমেদের প্রবন্ধে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথেই কিন্তু ভারতের মত সংবিধান রচনা হয়নি। পাকিস্তানের সংবিধান রচনা হয় ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ এবং তা বলবৎ হয় ৭.৬.১৯৬২। অপরপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ অল্প সময়ের মধ্যে নিজস্ব সংবিধান রচনা করতে সমর্থ হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান চালু হয়

১৬.১২.১৯৭২-এ। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার ইতিহাস গবেষক আহমেদ খুব প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম যে একমাত্র কূটনৈতিক সম্পর্কের ধারক ও বাহক হতে পারে না তার এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক সইফুল্লাহর প্রবন্ধে। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ধর্মে ইসলাম হলেও পাকিস্তান যেভাবে আরব দেশগুলির সমর্থন পেয়েছিল, বাংলাদেশ তা থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল। যার মূলে একদিকে ছিল পাকিস্তানের সাথে আরব মুসলিম দেশগুলির দীর্ঘদিনের পরিচিতি, অপরদিকে ছিল বাংলাদেশ যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে সোভিয়েট সাহায্য যা আরব বিশ্বে বাংলাদেশকে কিছুটা একঘরে করে রেখেছিল। অধ্যাপক সইফুল্লাহর সুনিপুণ বিশ্লেষণে এটা উঠে এসেছে যে আরব মৈত্রীর জন্য বাংলাদেশকে যেমন কমিউনিস্ট বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ-এর একতা ত্যাগ করে মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার আলোচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত তেরখাদা, চট্টগ্রাম জেলা, গারোপাহাড় সংলগ্ন কামালপুর বা কুমিল্লা জেলার অধীনে লাকসাম থানা অঞ্চলের অধিবাসীদের শক্তিশালী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ, গেরিলা আক্রমণ প্রভৃতি খুব চমৎকার ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে মালতীলতা বাড়ই, মো. মাহবুবুল হক্, মো. মোস্তাফা কামাল, সৈয়দ মো. আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, গোলাম কুদ্দুস লাবলু প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধসমূহে। প্রতিটি অঞ্চলের আলোচনায় প্রাবন্ধিকরা ক্ষেত্র সমীক্ষার মূল ধারাগুলিকে অতি চমৎকার ভাবে অনুসরণ করে আঞ্চলিক শক্তির কাছে পাক্ বাহিনী কিভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল তার বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করলেও বাংলাদেশ যুদ্ধে অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরার ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। কিন্তু এ নিয়ে এর আগে বিশদ কোন আলোচনা হয়নি। মো. আবুমুসা এ অভাব পূরণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় কিভাবে আগরতলায় আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ মিলিত হতেন। ভারতের উদ্যোগে আগরতলায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং অসংখ্য শরণার্থী শিবিরও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে তারা কখনই পরাঙ্মুখ ছিল না। এ তথ্যও মো. আবুমুসার লেখা থেকে জানা যায়।

যে কোন প্রতিবাদী আন্দোলনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের যুদ্ধও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে অধ্যাপক সুনীল কান্তি দে একটি ছোট্ট অথচ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় বাংলাদেশ যুদ্ধের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সহায়ককেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল যার মাধ্যমে শরণার্থীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা থেকে বাংলাদেশের অধ্যাপকদের ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সাময়িক পড়ানোর ব্যবস্থা করা---ইত্যাদি সকল কাজই এই সহায়ককেন্দ্র করেছিল। এমনকি বাংলাদেশের যুদ্ধ যাতে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের সমর্থন পায় তারজন্যও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট হয়েছিল এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। এ তথ্যগুলি এর আগে এত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়নি এবং তারজন্য অধ্যাপক দে-কে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ কিভাবে একে অপরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক মো. মীর সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরীর প্রবন্ধে। অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে উপলক্ষ করে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া কিভাবে নৌ-যুদ্ধের প্রায় কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল তার

একটা মনোজ্ঞ বিবরণ পেশ করেছেন। পাঠকের এই প্রবন্ধ থেকে অনেক নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হবেন যেমন 'Tilt Policy' যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিকসন পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কেসিঙ্গারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য দেবার। ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসী নৌ-নীতি কিভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণে প্রতিহত হয় এবং সোভিয়েট সহযোগিতায় বাংলাদেশের যুদ্ধ সত্বর শেষ হয় তার এক চমৎকার আলোচনা স্থান পেয়েছে অধ্যাপক চৌধুরীর লেখায়।

অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর আর একটি প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে খুলনায় অবস্থিত বাংলাদেশের নৌ-বাহিনী যে শক্তিশালী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তার একটা সত্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন পেশ করেছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে পাক বাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার লাঞ্ছনার কথা। এর সাথে সাথে উঠে এসেছে মুক্তিকামী অসংখ্য মানুষের আত্মবলিদানের কাহিনী। প্রবন্ধে একটি আকর্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ আছে এবং তা হল স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পাক বাহিনীর উপর আক্রমণের দুটি 'কোডে'-এর ব্যবহার। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের গানের একটি সূত্র ধরে আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া হত এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের আর একটি সূত্র ধরে আক্রমণ শুরু হত। পাঠকদের কৌতূহল জাগিয়ে রাখার জন্য গান দুটির প্রথম পংক্তি উল্লেখ করা হল না—আগ্রহী পাঠকেরা বইতে পাবেন। অধ্যাপক চৌধুরীর লেখা থেকে এ তথ্যও জানা যায় যে ফ্রান্সে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর বাঙালী নাবিকেরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে যোগ দেন। অধ্যাপক সুনীল কান্তি দে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লালমণির হাটের তরুণ নেতা আবুল হাসানের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা। আবুল হাসান ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক ও শেখ মুজিবুরের সহযোগী। তবে যে দুঃসাহসিক কাজের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তা হল কুড়িগ্রাম মহকুমার ট্রেজারি লুঠ। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং চরম বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি অন্যান্য মুক্তি যোদ্ধাদের সহৃদয়তায় ট্রেজারি থেকে সমস্ত টাকা সোনা ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ ভারতের কোচবিহারে নিয়ে আসেন। সেখানে ডি. এম. এবং এম.পি.-র উপস্থিতিতে কোচবিহার ট্রেজারিতে জমা দেন। পরে কলকাতায় অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর হাতে ট্রেজারির সমস্ত কাগজপত্র জমা দেন। যে কোন যুদ্ধে অর্থের সঙ্কুলান করা একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের যুদ্ধও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আবুল হাসানের লুঠ করা সম্পদ যে বাংলাদেশের যুদ্ধে বিরাট অক্সিজেন যুগিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অজানা কাহিনী প্রকাশ করার জন্য প্রাবন্ধিক অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখতে পারেন।

মোসা. ছায়িদা আখতার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সাংস্কৃতিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পাক সরকার পাকিস্তান বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করলে মহিলা শিল্পীদল এই সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই বীরত্বের আখ্যান খুব চমৎকার ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে অধ্যাপক আখতারের প্রবন্ধে। বাংলা বর্ণমালা সংস্কারকে কেন্দ্র করেও পূর্ব পাকিস্তানের মহিলারা প্রতিবাদ করেছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের মহিলারা প্রথম থেকেই বাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত এলে তার প্রতিরোধ করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী ও তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর মহিলারা এবং বাংলাদেশ বেতারে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মহিলারা দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কবিতার মধ্য দিয়ে সাধারণের মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন সেই কাহিনী অধ্যাপক হায়দার তাঁর লেখায় সুনিপুণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। মহিলা চলচ্চিত্র শিল্পীরাও এ সংগ্রামের বাইরে ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কবরী সারোয়ারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হলে কি প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই বেতারকেন্দ্রের কাজ চলত তার এক অজানা কাহিনী শুনিয়েছেন অঞ্জলি দাস। বেতারকেন্দ্রের নানা

কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে নাট্যকার কল্যাণ মিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। কল্যাণ মিত্রের নাটক 'জল্লাদের দরবারে' কিভাবে জনমানসে বিপুল সাড়া ফেলেছিল তা জানা যায় তাঁর প্রবন্ধ থেকে।

অধ্যাপক সুনীল কান্তি দে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রণবেশ সেনের লেখা 'সংবাদ পরিক্রমা'-র ভূমিকা নিয়ে। ১৯৭১-এর উত্তাল সময়ে প্রণবেশ সেন-এর লেখা সংবাদ পরিক্রমা যখন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ত, তখন এক বিশাল উন্মাদনার সৃষ্টি হত। তাঁদের এই যুগলবন্দী কলকাতা বেতারকেন্দ্রকে এক উচ্চমহিমায় স্থাপন করেছিল। অধ্যাপক দে-র লেখায় কিন্তু আক্ষেপের সুর শোনা গেছে। তাঁর বক্তব্য প্রণবেশ সেন সহ অন্যান্য কুশীলবরা যাঁরা সংবাদ পরিক্রমা বা বিভিন্ন কথিকা লিখে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়েছিলেন, তাঁদের এই কৃতিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। অধ্যাপক দে-র এই সমালোচনা যথার্থই গ্রহণীয়।

যে কোন জাতির ক্রান্তিকালে কথাসাহিত্যের একটা সদর্থক ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রকাশিত। অধ্যাপক মোরশেদ আলম বাংলাদেশ যুদ্ধের পটভূমিকায় আনোয়ার পাশা রচিত *রাইফেল, রোটি আওরত* উপন্যাসের এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পাক বাহিনীর অত্যাচারে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের তথা সাধারণ নারীদের মানবতার চরম অপমানের শিকার হতে হয়েছিল। পাক বাহিনীর হাতে ৯ মাসের যুদ্ধে প্রায় ১৪ লক্ষ নারী নির্যাতিত, নিগৃহীত ও নিঃস্ব হয়েছিল। তবে এই করুণ সুরের মধ্যে উপন্যাসে বীররসেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় নির্যাতিতা নারী পলি বা রোশেনারারা আত্মঘাতী 'মাইন'-এ পাক সৈন্য ধ্বংস করেছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই বইটি আলোচনার জন্য বেছে নেওয়ায় অধ্যাপক আলন আহমেদ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অধ্যাপক ব্রততী হোড় তাঁর প্রবন্ধে দুই শোক-বিধুরা মহিলা লেখকের দুটি বই-এর আলোচনা করেন। একটি বই বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা লিখিত *একাত্তরের স্মৃতি*, অপর বইটি হল জাহানারা ইমাম রচিত *একাত্তরের দিনগুলি*। দুটি বই-এরই মূল উপজীব্য হল বাংলাদেশের সাজানো গোছানো সংসারগুলি কাল ভৈরবের মত পাক বাহিনীর অত্যাচারে কিভাবে ধ্বংস-প্রাপ্ত হল তার মর্মস্পর্শী আখ্যান। বস্তুত, বাংলাদেশের নির্যাতিত বহু পরিবারের প্রতিনিধি স্বরূপ এই বইগুলি এবং তার জন্য লেখিকারা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। দুই বইয়ে উঠে এসেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে মহোত্তর পথে উত্তরণ। অধ্যাপক হোড় খুবই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বই দুটির আলোচনা করেছেন।

যুদ্ধকালে ফুটবল খেলাও যে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তার এক পরিচয় পাওয়া যায় শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে। তাঁর মতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই তাদের সহযোগী অংশ বলে মনে করেনি। শিক্ষা, চাকরি, অর্থনীতি সবেতেই পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রেও এই বৈষম্য অনুসরণ করা হত। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক বাঙালি খেলোয়াড়রা জাতীয়দলে সুযোগ পেতে বঞ্চিত হত। এই সকল বঞ্চনার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ফুটবল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক আগ্রাসী পথ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে প্রভূত অর্থ অর্জন করে এবং এই অর্থ বাংলাদেশের ত্রাণ তহবিল পরিপুষ্ট করে। প্রতিটি খেলার আগে খেলোয়াড়রা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করত। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে একটা জনমত গড়ে ওঠে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সুন্দরভাবে বাংলাদেশের ফুটবল যোদ্ধাদের কথা শুনিয়েছেন।

অধ্যাপক খালেদ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশ যুদ্ধে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদী* পত্রিকার সংগ্রামী ভূমিকা। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি প্রথম থেকেই শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

আন্দোলনের সমর্থক ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সংগ্রামী রূপ আরও প্রকট হয়। কিন্তু সরাসরি পাকিস্তানের বিরোধিতা করার অসুবিধা থাকায় বিভিন্ন ব্যাকের আড়ালে তারা পাক্ বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। পাক সরকারের রোষানলে কাগজ সাময়িক বন্ধ থাকলেও *আজাদী পত্রিকা* পুনরায় প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শুধু একমাত্র *আজাদী পত্রিকা*-ই প্রকাশিত হয়। সেদিন থেকে বলা যেতে পারে যে *দৈনিক আজাদী* স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। এবং এখানেই *দৈনিক আজাদী*-র কৃতিত্ব।

পরিশেষে আশীষ কুমার দাস ও অমিয় কুমার বাউলকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়, এই মূল্যবান আকর গ্রন্থটি সুচারুভাবে সম্পাদনার জন্য। তবে একটি মৃদু অনুযোগ রেখে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। অসংখ্য মুদ্রণ প্রমাদ থাকার জন্য বইটির সুষ্ঠু পাঠ ব্যাহত হয়। আশা করা যায় পরের সংস্করণে এদিকে নজর দেওয়া হবে।

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়
গবেষক

Book Bazar

Buyers at the Book Bazar held in the premises of The Asiatic Society during 19-23 September 2023.

Just Published

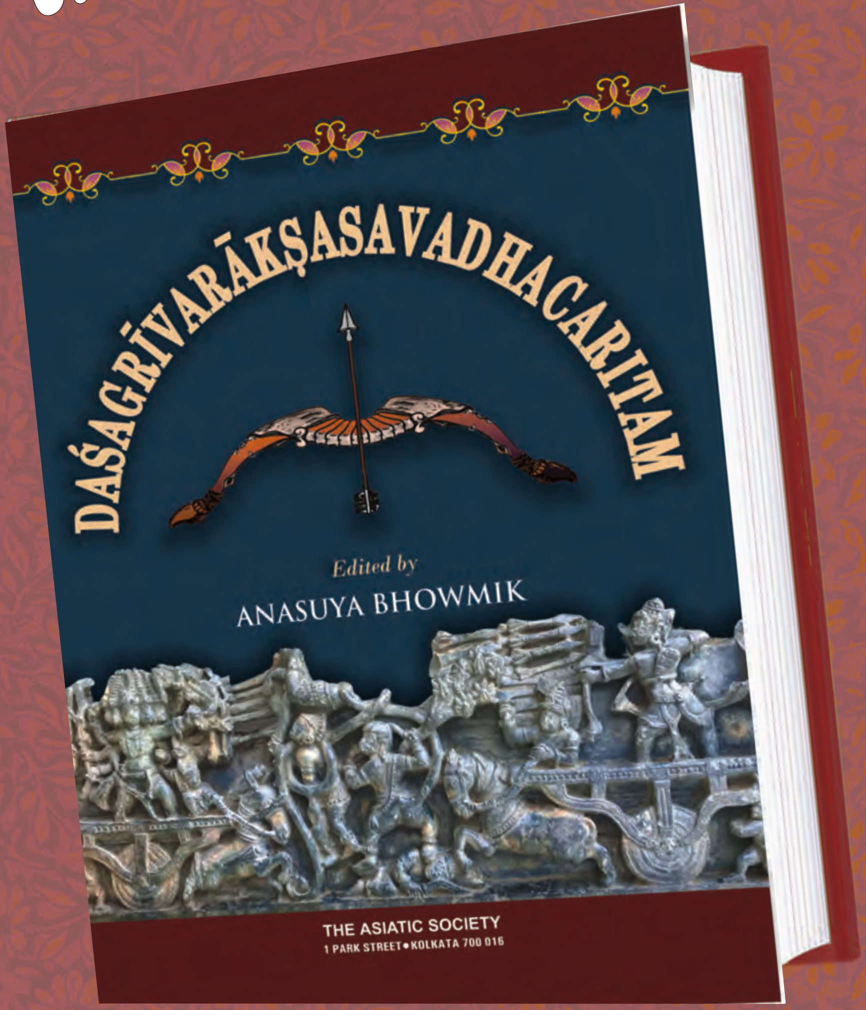

₹ 3000

Just Published

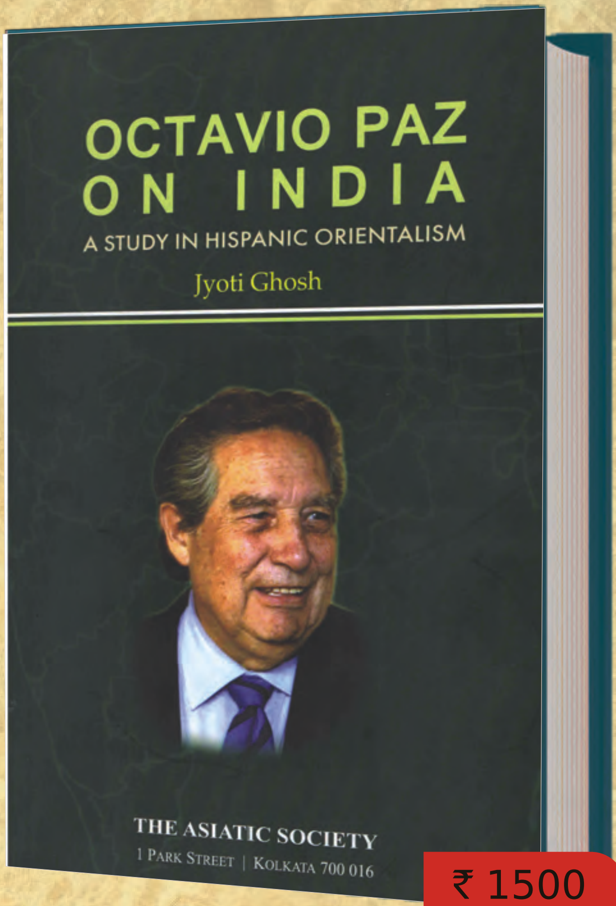

₹ 1500

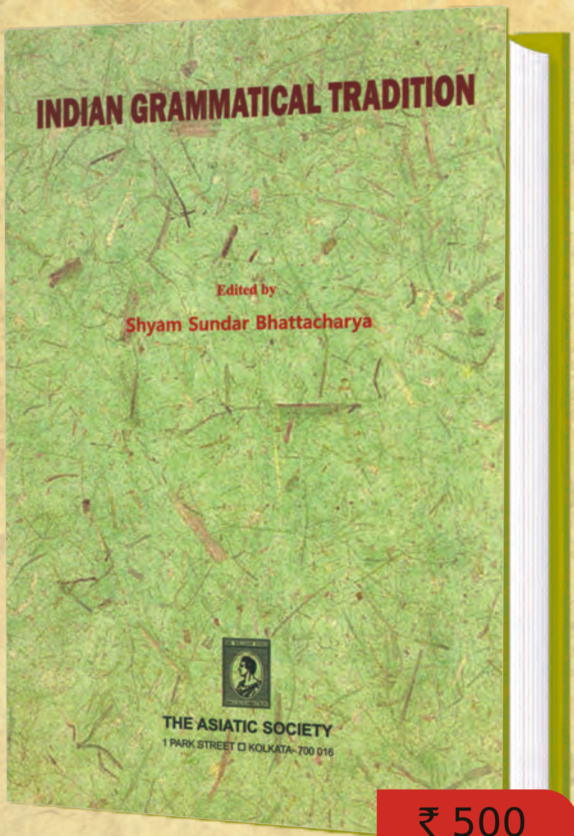

₹ 500

Published by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : generalsecretary-ask@asiaticsocietykolkata.nic.in
Web: www.asiaticsocietykolkata.org
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com